বোমার ভয়ে বার্ম্মা ত্যাগঃ

শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

২৫শে এপ্রিল, ১৯৪২

উৎসর্গ

রেণু,

মনে পড়ে দিনগুলি দুঃস্বপ্নের মত
ভয়ে শিহরি' উঠি' কণ্টকিত চিত্ত।
সম্মুখে গর্জ্জিছে শত্রু—কাঁপে জল-স্থল,
পশ্চাতে লুণ্ঠন-আশে লম্পটের দল।
আমরা কম্পিত দোঁহে—নীড়ে যথা পাখী
গুটিপাঁচ শাবকেরে পক্ষপুটে ঢাকি'।
বৃক্ষ বাহি' ওঠে সর্প, আগাইয়া আসে,
মাথার উপরে বাজ উড়িছে আকাশে।
ছুটিলাম ঊর্দ্ধশ্বাসে হাতে হাত ধরি'
বক্ষে চাপি' শিশুক'টি—বাঁচি কিম্বা মরি!
অবশেষে নাহি জানি কোন্ পুণ্যফলে
পার হনু দীর্ঘপথ কোন্ মনোবলে।
অতিক্রম' নদ-নদী আর গিরি-বন,
মিলিল আশ্রয় পুনঃ আপনার জন।

*　　　*　　　*

একথা রহিল লেখা পুঁথির পাতায়,
একথা রহিবে গাঁথা মনের খাতায়।

মার্চ্চ, ১৯৪৪
মালধ, ফরিদপুর

মনোরঞ্জন

ভূমিকা

১৯১৪ সালের যুদ্ধকে বলা হয় "ইউরোপের মহাসমর"; কাজেই এই বর্ত্তমান যুদ্ধকে একটা ভিন্ন নামে বলিতে গেলে বলা চলে "পৃথিবীর মহাযুদ্ধ"। হয়ত এই যুদ্ধই হইবে পৃথিবীর মহত্তর বা মহত্তম যুদ্ধ। কিন্তু ইহা লইয়া বিতর্ক করিয়া কোন লাভ নাই—ইহার মীমাংসার ভার দেওয়া হউক আগামী কালের ইতিহাস-লেখকদিগের হাতে। বার্ম্মা-রোড এই যুদ্ধের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান জুড়িয়া থাকিবে। কারণ, এই বার্ম্মা-রোডটিকে কেন্দ্র করিয়াই সমরানল এশিয়ার অনেকখানি স্থানে দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

সকলেই জানেন, ক্রমাগত চারি-পাঁচ বৎসর যুদ্ধ চালাইয়া এশিয়ার সমর-গর্ব্বিত জাপান তাহার প্রতিবেশী চীনকে প্রায় কাবু করিয়া ফেলিয়াছিল। বেচারা চীন যেন হাঁফ ছাড়িবারও অবকাশ পাইতেছিল না। চীনের এই অসহায় অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সকলেই চীনের প্রতি দূর হইতে সহানুভূতি-সূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন। অবশ্য প্রকৃত দুর্ব্বলের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন অস্বাভাবিক কিছু নয়—সে ব্যক্তিগতই হউক বা জাতিগতই হউক।

জাতিগত সহানুভূতির পেছনে অবশ্য থাকে রাজনৈতিক চাল ও ব্যবসায়-বুদ্ধি। আমেরিকা কিছু-কিছু সমরোপকরণ—বিশেষ করিয়া মোটর-ট্রাক ও মোটর-লরী দিয়া চীনকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইল, হয়ত উচিত মূল্য ও নিছক ব্যবসায়ের খাতিরে। এই সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম চীনে পাঠাইবার একমাত্র পথ বার্ম্মা। বার্ম্মার রাজধানী রেঙ্গুণ হইতে একটি সুপ্রশস্ত পাকা সড়ক একটানা চলিয়া গিয়াছে বার্ম্মার উত্তর প্রান্ত লাসিও পর্য্যন্ত। লাসিও অতিক্রম করিয়া কিছুদূর গেলেই চীনের প্রসিদ্ধ সহর চুনকিং। কাজেই এই রাস্তাটা যেন চীনের জীবন-মরণের মধ্যে একটা যোগসূত্রের মত।

আমাদের ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ঠিক করিলেন, এই রাস্তা দিয়া চীনের দিকে যে সমস্ত সমরোপকরণ যাইবে, তাহাতে তাঁহারা কোনরূপ বাধা দিবেন না। জাপান অবশ্য অনবরত হুমকি দেখাইতেছে যে, ব্রিটিশ যদি চীনে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাইতে কিঞ্চিন্মাত্র সাহায্যও করে, তবে তাহার ফল হইবে খুবই অশুভ। কিন্তু এই সমস্ত হুমকি অগ্রাহ্য করিয়া ১৯৪১ সনের ৮ই ডিসেম্বর বার্ম্মা-গভর্ণমেণ্ট বার্ম্মা-রোডটি উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে জলস্রোতের মত হু-হু করিয়া অবিশ্রাম সমরোপকরণবাহী মোটর-লরী-বাহিনী চীনের দিকে ধাবিত হইল।

স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, চীন-বার্ম্মা রোডটি উন্মুক্ত করিবার পেছনে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের শুধু সহানুভূতি বা পরোপকার-স্পৃহাই প্রবল ছিল না, আর একটি কারণও ছিল। সেই কারণটি একেবারেই উপেক্ষণীয় নহে।

বার্ম্মার নিকটতম প্রতিবেশী চীন। চীন ও বার্ম্মা এই দুই রাজ্যের দুই প্রান্ত যে একটি রেখায় মিলিত হইয়াছে, তাহা হইতে এক পা বাড়াইলেই ব্রিটিশ অধিকারে প্রবেশ করা যায়। চীন পরাভূত হইলে, জাপান যে-কোন মুহূর্ত্তে ব্রিটিশ-অধিকৃত বার্ম্মায় প্রবেশ করিয়া গোলযোগ সুরু করিতে পারে, এই আশঙ্কা বহু পূর্ব্ব হইতেই ব্রিটিশ সমর-বিশারদ-দিগের মনে স্থান পাইয়াছিল। সুতরাং চীন যদি জাপানকে দূরে হটাইয়া রাখিতে পারে, তাহা হইলে উহা ব্রিটিশ—তথা বার্ম্মা-গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কম স্বস্তির কারণ হয় না। কাজেই চীনকে ব্রিটিশ-গভর্ণমেণ্টের এই সাহায্যটুকু না করিয়া থাকিবার কোন উপায় ছিল না। সুতরাং চীন-বার্ম্মা রোড খুলিয়া দিয়া আমাদের গভর্ণমেণ্ট আরও হুঁশিয়ার হইয়া রহিলেন। মোট কথা, জাপানী আক্রমণের জন্য বার্ম্মা-গভর্ণমেণ্ট একরকম প্রস্তুত হইয়াই রহিলেন।

মনে রাখিতে হইবে, আধুনিক যুদ্ধ এক হিসাবে শুধু এরোপ্লেনের

যুদ্ধ। কাজেই এই প্রস্তুত হওয়ার মানে—প্রধানতঃ বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া।

আমাদের যতটুকু জ্ঞান আছে, তাহাতে উচ্চকণ্ঠেই ইহা ঘোষণা করা যাইতে পারে যে, জাপানী বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। রেঙ্গুণের 'ওয়ার-অফিস' তখন কর্ম্মব্যস্ত। শত্রু-বিমানের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণের জন্য 'অবজারভার্ কোর্' নিযুক্ত হইয়াছে। কোথায় কয়খানা শত্রু-বিমান কোন্ দিক হইতে কোন্ দিকে গেল, অবজারভার্ কোরের মারফৎ তাহা জানিবামাত্র 'ওয়ার-অফিস' বিমান-বিধ্বংসী কামান লইয়া হুশিয়ার হইয়া থাকেন। জনসাধারণকেও 'সাইরেন' বাজাইয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়। অবশ্য বার্ম্মাতে—বিশেষ করিয়া রেঙ্গুণ রক্ষার জন্যই এই ব্যবস্থা হইয়াছিল।

এইভাবে বিবিধ পন্থায় জাপানী বিমান-আক্রমণ ও তাহার ধ্বংসোদ্দেশ্য পণ্ড করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বনে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কিছুমাত্র শৈথিল্য প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও
২৫শে এপ্রিল, ১৯৪২
বার্ম্মার ছোট-বড় অনেক সহরেই জাপানী বিমান হইতে ভীষণ বোমা বর্ষণ হইয়া গেল। তারপর, একদিন রেঙ্গুণও তাহা হইতে অব্যাহতি পাইল না—আর সেইদিন হইতেই আরম্ভ হইল বার্ম্মাপ্রবাসী ভারতীয়দের সার্ব্বজনীন চরম দুঃখ। এই গ্রন্থ তাহারই একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা মাত্র।

সালথ, ফরিদপুর
২৫শে এপ্রিল, ১৯৪২

শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

বোমার ভয়ে বর্ম্মা ত্যাগ—

'সাইরেন'

● **২৩শে ডিসেম্বর** (১৯৪১)—আর দুই দিন পরেই ক্রিষ্ট্‌মাস উৎসব—বড়দিনের আনন্দ! যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যেও রেঙ্গুণ-প্রবাসী ইংরেজগণ ও অন্যান্য খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ যথাসম্ভব উৎসবের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। ঘরবাড়ী পুষ্প-পতাকায় সজ্জিত হইতেছে, হোটেল-ক্লাবে নাচ-গানের মহড়া চলিতেছে, কোথাও চলিতেছে অভিনয়ের রিহার্শেল। দোকানে-দোকানে অসম্ভব ভীড়—বিশেষ করিয়া পুতুলের দোকানে আর পোষাকের দোকানে। দর্জ্জিরা হয়ত হিসাব করিয়া দেখিতেছে বিগত বছর অপেক্ষা এই বছর—এই যুদ্ধের বাজারে অর্ডারের সংখ্যাটা তাহাদের কিছু কম, তবু তাহাদের উৎসাহের সীমা নাই।

বোমার ভয়ে বার্ম্মা-ত্যাগ

বেলা প্রায় দশটা—অফিসার ও কেরাণীর দল চলিয়াছে অফিসের দিকে। যুদ্ধের জন্য এক রবিবার ছাড়া সমস্ত ছুটি বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে; সরকারী চাকুরেরা হয়ত খানিকটা মনঃক্ষুণ্ণ, তাঁহাদের গতি মন্থর। হঠাৎ 'সাইরেন' বাজিয়া উঠিল,—"উ—উ—উ!"

এই তীব্র কর্কশ আওয়াজে সচকিত হইয়া পথযাত্রীরা যেন খানিকটা বিহ্বল হইয়া পড়িল! কেহ-কেহ পথের পার্শ্ববর্ত্তী পরিখাতে নামিয়া পড়িল কিন্তু অধিকাংশই দ্রুত পা চালাইতে লাগিল স্ব-স্ব গন্তব্য স্থানের দিকে। কেহ-কেহ বা ফুটপাথে দাঁড়াইয়াই ঊর্দ্ধমুখে আকাশের দিকে দেখিতে লাগিল সত্যই কোন শত্রুপক্ষীয় বিমান হানা দিয়াছে কিনা!

বোমা-বর্ষণ

● **সত্যিকার বিপদ্**—রেঙ্গুণের লোক মাস-খানেক যাবত একাধিকবার সাইরেন শুনিয়াছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত বিমান-আক্রমণ হয় নাই। সে জন্য এইবারও অনেকেই যেন সাইরেনটাকে বেশী গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিল না। আমাদের ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের জঙ্গী বিমানগুলি ততক্ষণে বাধা দিবার জন্য উপরে উঠিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু বোমা-বর্ষণও ততক্ষণে সুরু। চারিদিকেই কেবল শব্দ হইতেছে, "বুম্-বুম্-বুম্!"

পথচারীরা তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। দড়াম-দড়াম হুড়মুড় করিয়া, তিনতলা চারতলা বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ইহার মধ্যে আবার শব্দ শুনা যাইতেছে, "ট্যাট্যে—ট্যাট্যে—ট্যা!" মেশিন-গানের আওয়াজ!

জাপানীরা অনেকখানি নীচুতে নামিয়া এরোপ্লেন হইতেই অসহায় জনতার উপর চালাইতেছে মেশিন-গান। এই দুপুরেও বোমার ধূমে সহর অন্ধকার। তবু ইহার মধ্যেই লোকজনের ছুটাছুটির বিরাম নাই। আতঙ্কিত জনতার অমানুষিক চীৎকারে এক বিরাট হট্টগোলের সৃষ্টি হইল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে 'অল্-ক্লিয়ার' সঙ্কেত শুনিতে পাওয়া গেল।

বোমার পরে

● **পরিখায়**—আমি একটা পরিখাতে এতক্ষণ মড়ার মত পড়িয়া ছিলাম। দেবদেবীর জন্য কোনদিন মাথা ঘামাই নাই, "মা দুর্গা" বা "মা কালীর" নাম স্মরণেও আসে নাই। সেদিন স্মরণ হইল বটে, কিন্তু স্মরণ হইলেও উচ্চারণ করিবার উপায় ছিল না --গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছিল! সে এক অসম্ভব রকমের পিপাসা! ভয়ে যে এমন পিসাসা হইতে পারে, অন্য কেহ হয়ত ধারণা করিতেও পারিবে না।

অতিকষ্টে হামাগুড়ি দিয়া পরিখা হইতে মাথা তুলিলাম। দেখিলাম, হাত-দশেক দূরে একজন বর্ম্মী ও প্যান্টপরা দুইজন মাদ্রাজী মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। জীবিত কিনা বুঝা গেল না। একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বর্ষীয়সী ভদ্র-মহিলা পরিখা হইতে এক কুলীকে টানিয়া তুলিতেছেন; মনে হইল, কুলীটি গুরুতর আহত।

আস্তে-আস্তে অগ্রসর হইলাম। তখনই চোখে পড়িল আবার এক দৃশ্য! একটা নালার মত স্থানে আঠারো-উনিশ বছরের দুইটি বর্ম্মী কিশোর জড়াজড়ি করিয়া পড়িয়া আছে।

কাছে গিয়া তাহাদের ডাকিলাম।

বেচারারা দুই ভাই। ছোট ভাইটিকে বোমার হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য বড় ভাই তাহাকে আবরণ করিয়া শুইয়া পড়ে। বোমা ফাটিয়া তাহাদের কিছু ক্ষতি করিতে পারে নাই বটে,

কিন্তু মেশিন-গানের একটি গুলি বড় ভাইটির দক্ষিণ বাহু ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। পরণের কাপড় ছিঁড়িয়া ছোট ভাই ও আমি দুই জনে ক্ষতস্থানটা বাঁধিয়া দিলাম, পরক্ষণেই ছুটিলাম জলের জন্য।

একটা জলের কল পাওয়া গেল বটে, কিন্তু বোমার আঘাতে পাইপ ফাটিয়া যাওয়ায় এক ফোঁটা জলও পাওয়া গেল না। পিপাসায় তখন আমি দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য—পাগলের মত ছুটিতে লাগিলাম এদিক-ওদিক। হঠাৎ দেখি, নিকটেই বোমা পড়িয়া একটা বৃহৎ কূপের সৃষ্টি হইয়াছে এবং কিছু জলও উঠিয়াছে।

লাফ দিয়া নামিয়া পড়িলাম এবং হাঁটু গাড়িয়া দুই হাতে ঐ বিস্বাদ জল আকণ্ঠ পান করিলাম। অফিসের কথা আর মনেও পড়িল না—ফিরিয়া চলিলাম ঘরের দিকে।

● **আবার পথে**—রাস্তায় অসম্ভব ভীড়! ভয়ার্ত্ত জনতা ছুটিয়া চলিয়াছে—ষ্টেশনের দিকে। প্যাণ্টপরা বাবু ও সাহেবের কাঁধেও বড়-বড় স্যুটকেশ! আজ একশ' টাকা দিয়াও একজন কুলী পাইবার জো নাই। প্রাণভয়ে যে যেখানে পারে, পলাইতেছে।

ঘরের দুয়ারে উপস্থিত হইলাম। তিনতলা বাড়ীর দোতলায় থাকি। চাহিয়া দেখি, উপরের তলা উড়িয়া গিয়াছে। সিঁড়ি বাহিয়া অতি দ্রুত দোতলায় উঠিয়া ছেলেমেয়েদের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলাম। ঘরের দরজা খোলা—কিন্তু কাহারও সাড়া পাওয়া গেল না।

ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখি—জিনিষ-পত্র লণ্ডভণ্ড, বাক্স-পেটরা খোলা, কাপড়-চোপড় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

রাস্তায়ই দেখিয়াছিলাম দুই-একটা দোকান লুট হইতেছে; কাজেই বুঝা গেল, আমারও যথাসর্ব্বস্ব লুট হইয়াছে। হায়রে, কাহারও সর্ব্বনাশ, কাহারও পৌষ মাস! যা হোক্, টাকাকড়ি জিনিষপত্র নয় গেল,—কিন্তু ছেলেমেয়ে বৌ? এরা সব গেল কোথায়?

উন্মাদ হইতে আর কতক্ষণ? হয়ত সিঁড়ি দিয়াই নামিতে গিয়াছিলাম কিন্তু পায়ে কোন সিঁড়ি ঠেকিল না—হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া গেলাম। কোথায় আর কত নীচে পড়িলাম, ঠাহর হইল না—সব অন্ধকার! আস্তে-আস্তে চোখ দুটি বুজিয়া গেল, কিন্তু জ্ঞান একেবারে লোপ পায় নাই। মাথায় তীব্র বেদনা অনুভূত হইল—গলা হইতে গোঁ-গোঁ শব্দ বাহির হইতে লাগিল। আশ্চর্য্য, মড়ার মত পড়িয়া আছি, কিন্তু নিজেই নিজের কাতর গোঙানি শুনিতেছিলাম!

● **মৃতের পাশে**—কতক্ষণ এইভাবে ছিলাম বলিতে পারি না। হঠাৎ এক সময় বোধ হইল, আমাকে যেন ধরাধরি করিয়া একটা মোটর-লরীতে তুলিয়া দেওয়া হইতেছে। চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখি, অনেকগুলি মড়া পূর্ব্বেই লরীতে বোঝাই হইয়াছে। কাহারও-কাহারও আহত স্থান হইতে তখনও রক্ত পড়িতেছে।

তবে কি আমাকেও এরা মড়ার দলে ফেলিল নাকি

এখনই জ্ঞান ফিরিয়া না আসিলে হয়ত জীবিতাবস্থায়ই কবরে স্থান পাইতে হইবে! কাজেই প্রাণপণ শক্তিতে উঠিয়া বসিলাম এবং নিজেই অতিকষ্টে লরী হইতে নামিয়া পড়িলাম।

লরী-ড্রাইভার ও যাহারা মড়া বোঝাই করিতেছিল, তাহারা অনেকখানি আমোদ পাইল; কারণ, আমাকে নামিতে দেখিয়াই তাহারা হাসিয়া উঠিল। একজন বলিল, "এটা ভূত নাকি রে?"

আস্তে-আস্তে হাঁটিয়া চলিলাম। নিকটেই হাসপাতাল। ডান-হাঁটুটা অনেকখানি ফুলিয়া উঠিয়াছিল—আর হাঁটিতেও পারিতেছিলাম না। কাজেই হাসপাতালে গিয়াই ঢুকিলাম।

● **২৪শে ডিসেম্বর**—পরের দিন হাসপাতাল হইতে বাহির হইয়াই পথে শ্রীহরের সঙ্গে দেখা। শ্রীহর আমার মাস্‌তুত ভাই—মার্চ্চেন্ট-অফিসে কাজ করে। সে বলিল, তাহার ও আমার পরিবার গতকল্যই সে টাঙ্গুতে পাঠাইয়া দিয়াছে। আমার স্ত্রী অবশ্য আমার খবর না জানা পর্য্যন্ত যাইতে চাহে নাই, অনেক বুঝাইয়া-সুঝাইয়া পাঠানো হইয়াছে।

যাহা হউক, নিশ্চিন্ত হইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলাম।

টাঙ্গুতে একটা টেলিগ্রাম করিব বলিয়া দুইজনে গিয়া ঢুকিলাম সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ-অফিসে। কিন্তু—ও হরি! সেখানে গিয়া দেখি যেন মেছোহাটা বসিয়াছে—অসম্ভব ভীড়! প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করিবার পর অবশেষে একটা এক্সপ্রেস্ টেলিগ্রাম পাঠাইতে পারিলাম।

ভাঙন্ আরম্ভ

● ধ্বংসের নমুনা—এইবার সহর ঘুরিয়া দেখিবার পালা—ধ্বংসের নমুনাটা অন্ততঃ পরখ করা চাই। কিন্তু রাস্তায় যান-বাহন-চলাচল বন্ধ, লোকজনও নাই বলিলেই চলে। দেখিলাম, অনেকেই বোচকা-বুচকী মাথায় লইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে ষ্টেশনের দিকে। সহরে জোর ভাঙন্ লাগিয়াছে—সকলেই প্রাণভয়ে পলাইতেছে।

একটা ভাঙ্গা বাড়ীর কাছ দিয়া যাইতেছিলাম। বোমার ঘায়ে বাড়ীটার চারতলার ছাদ উড়িয়া গিয়াছে। দোতলার এক জানালা হইতে এক বৃদ্ধা আমাদের চীৎকার করিয়া ডাকিল এবং উপরে যাইতে ইসারা করিল।

শ্রীহর ইতস্ততঃ করিতে লাগিল; কিন্তু আমার মনে হইল, বৃদ্ধা হয়ত কোন গুরুতর বিপদে পড়িয়াছে। কাজেই শ্রীহরকে এক রকম জোর করিয়া সঙ্গে লইয়াই উপরে উঠিলাম।

ঘরে ঢুকিয়া দেখি, একদিকের দেয়াল ফাটিয়া চৌচির হইয়া গিয়াছে—পড়ে-পড়ে অবস্থা! ঘরের এক কোণে একখানা খাট পাতা, তাহাতে একটি দশ-এগার বছরের মেয়ে কম্বল গায়ে শুইয়া আছে।

বৃদ্ধা যাহা বলিল তাহার অর্থ মোটামুটি এই দাঁড়ায় যে, মেয়েটির টাইফয়েড কি নিমোনিয়া, এইরকম কোন অসুখ সপ্তাহখানেক যাবত চলিতেছে। জাপানী বিমান-আক্রমণের

বোমার ভয়ে পলাতক

সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের অন্যান্য সকলে যে যেদিকে পারে, পথ দেখিয়াছে ; কেবল বৃদ্ধাই তাহার নাত্‌নীটিকে ফেলিয়া যাইতে পারে নাই। আজ দুইদিন যাবত বৃদ্ধার আহার-নিদ্রা নাই। বৃদ্ধার ছেলে অর্থাৎ মেয়েটির বাপ শিক্ষিত এবং বেশ ভাল বেতনেই নামকরা এক বিলাতী ঔষধের দোকানে কাজ করে ; কিন্তু মেয়েটির মা নাই—সৎমা। বাপ তাহার নিজের মা ও মেয়েকে ফেলিয়া দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ও চাকরটিকে লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে! বিপদে এমনই হয় ; তখন একমাত্র মূলনীতি—"চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা।"

বৃদ্ধার হাতে টাকা আছে। তাহাদের কোন এক নিকট-আত্মীয় থাকে নেংলবিন সহরে—সেখানেই উহারা যাইতে চায়।

দুইজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিলাম। বাড়ীটা যে-কোন মুহূর্ত্তে ধ্বসিয়া যাইতে পারে। একটা বিহিত এখনই করা উচিত।

শ্রীহরকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া আমি নীচে নামিয়া গেলাম একটা গাড়ীর খোঁজে। ভাগ্যক্রমে একটা ঠিকা-গাড়ী পাওয়াও গেল ; কাজেই যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সকল ব্যবস্থা করিয়া, উহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম।

● **রেলওয়ে ষ্টেশনে**—ষ্টেশনে যাইয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমাদের চক্ষু উঠিল কপালে! এত ভীড় আর ঠেলাঠেলি যে, পুলিশও কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

লোকগুলি ট্রেনের উপর যেন ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে! বহুলোক হ্যাণ্ডেল ধরিয়া বাদুড়ের মত ঝুলিতেছে, কেহ-কেহ ছাদের উপরে যাইয়াও উঠিয়া বসিয়াছে। টিকেট দেয়ই বা কে, আর কিনেই বা কে?

হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া নোংরা কুলী-শ্রেণীর লোক ফার্ষ্ট ক্লাশে দাঁড়াইয়া-বসিয়া ঠাসাঠাসি, আর প্যাণ্টপরা বাবু-সাহেবরা থার্ড ক্লাশের পায়খানার জানালার কাঁচ ভাঙ্গিয়া মুখ বাড়াইয়া আছেন! কয়লা-বোঝাই খোলা মালগাড়ীর উপরও বহু লোক লুটোপুটি খাইতেছে—কয়লার রঙে তাহাদের দেখাইতেছে সার্কাসের ক্লাউনের মত!

একটা কাঁটা-তারের বাণ্ডিল-বোঝাই ওয়াগন্—উহাতেও যাইয়া লোক ঢুকিয়াছে। একটু নড়াচড়ি করিলেই কাঁটা-তারের খোঁচা খাইতে হয়। লোকগুলির মুখের ভাব দেখিয়া বোধ হইল, এইরূপ খোঁচা তাহারা বুঝি অনবরতই খাইতেছে—কিন্তু তবু যাইতেই হইবে! আতঙ্কের কালো ছায়া সকলের মুখে।

কতক্ষণ হইতে এই অসহ্য রৌদ্রের মধ্যে গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে, কে জানে? লোক আর কোথায় যে উঠিবে, বুঝিতে পারিলাম না। "জল," "জল," বলিয়া চীৎকার শুনা যাইতেছে; কিন্তু স্থান-ত্যাগের উপায় নাই; যাহারা পারিতেছে, জানালা দিয়া হাত বাড়াইতেছে। জল দেওয়া হইতেছে বটে কিন্তু সে কেবল মরুভূমিতে দুই-এক ফোঁটা বৃষ্টির মত!

যাত্রীদের মধ্যে শিশু আছে, স্ত্রীলোক আছে। অনেকেরই হয়ত জানা নাই কোথায় যাইতে হইবে! বোমার হাত হইতে হয়ত ইহারা নিস্তার পাইল, কিন্তু তারপর ?

"হ্যালো জন্!" বলিয়া বৃদ্ধা একটি এ্যাংলো-বার্ম্মেণ যুবককে আহ্বান করিল।

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, আমাদের সঙ্গী বৃদ্ধা ও তাহার নাত্নী হয়ত এ্যাংলো-বার্ম্মেণ

জন্ ছুটিয়া আসিয়া বৃদ্ধার হাত চাপিয়া ধরিল। মাথার টুপী দেখিয়া বুঝিলাম, যুবকটি একজন রেলওয়ে কর্ম্মচারী। হয়ত বৃদ্ধার কোন নিকট-আত্মীয়।

এক নিঃশ্বাসে বৃদ্ধা তাহার বিপদের কাহিনী বলিয়া গেল—সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করিল।

যুবকটি আমাদের অনেক ধন্যবাদ দিল এবং আমাদের কোন উপকারে আসিতে পারে কিনা সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল। আমরাও তাহাকে ধন্যবাদ জানাইলাম এবং বৃদ্ধা মহিলাটির ভার তাহার হাতে সঁপিয়া দিতে পারিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

বিদায় দিতে গিয়া মহিলাটি কাঁদিয়া ফেলিল এবং অবিলম্বে আমাদিগকে রেঙ্গুণ পরিত্যাগ করিতে বারবার অনুরোধ করিল।

সমস্ত দিনটা কাজে-কর্ম্মে আজ একরকম ভালই গেল। বোমার নামটাও হয়ত ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু সন্ধ্যা হইতেই ভয়টা আবার চাপিয়া ধরিল। রাত্রির অন্ধকারে আবার কি ঘটিয়া বসে, কে জানে! শুইলাম বটে কিন্তু সমস্ত রাত্রি আর

ঘুম হইল না। ভাগ্যে রাস্তায় যান-চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাহা না হইলে মোটরের শব্দেও হয়ত লাফাইয়া উঠিতাম !

● **২৫শে ডিসেম্বর**—স্থির করিলাম, একবার বি, আই, এস্, এন্, জাহাজ-কোম্পানীতে যাইতে হইবে। খোঁজ লইয়া দেখিব কবে ভারতের জাহাজ ছাড়িবে। স্ত্রী-পুত্র আর এদেশে রাখা চলে না। রেঙ্গুণে বোমা পড়িয়াছে—তুই-এক দিনের মধ্যেই টাঙ্গুতেই যে পড়িবে না, তাহাই বা কে জানে ?

জাহাজ-কোম্পানীতে উপস্থিত হইয়া দেখি—এক মহামারী ব্যাপার ! হাজাব-হাজার লোক টিকেটের জন্য অফিস-ঘরের তুয়ারে মাথা খুঁড়িতেছে। জাহাজ একখানা ছাড়িবে বটে কিন্তু ইতিমধ্যেই এক হাজাবের স্থানে, তিন হাজার প্যাসেঞ্জার বুক্ করা হইয়াছে—আর টিকেট কেনা শিবেরও অসাধ্য। ইহার মধ্যেই আবার কোন-কোন ধূর্ত্তলোক পূর্ব্ব হইতে টিকেট যোগাড় করিয়া, পরে একুশ টাকার টিকেট পঞ্চাশ টাকায় পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়াছে।

শুনিলাম, গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে নাকি ব্যবস্থা হইয়াছে —প্রথমে একমাত্র স্ত্রীলোক ও শিশুদেরই যাইতে দেওয়া হইবে, সঙ্গী হিসাবে এক-একটা পরিবারের সঙ্গে শুধু একজন করিয়া পুরুষ অভিভাবক যাইতে পারিবে।

এই ব্যবস্থা না করিয়া উপায় ছিল না ; কারণ, জাহাজের অভাব। কিন্তু ইহাও আবার কম অসুবিধার কারণ হইতেছে

না। এত ভীড়ে একজনের পক্ষে আর পাঁচজনের খবরদারী করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। তারপর জাহাজ কোথায় ভিড়িবে, কয়দিনে কোথায় যাইবে, তাহারও কোন ঠিক-ঠিকানা নাই। কলিকাতাগামী জাহাজ হয়ত গিয়া উপস্থিত হইল মাদ্রাজ বন্দরে। জাপানী আক্রমণের সঙ্গে-সঙ্গেই সমুদ্র-পথও বিপদসঙ্কুল বলিয়া গণ্য হইয়াছে। অতি গোপন এই জাহাজের গতিবিধি।

● **জাহাজ-ঘাটে**—কাহারও কোন উপকারে আসিতে পারি কিনা এই উদ্দেশ্যে জাহাজ-ঘাটে উপস্থিত হইলাম। দেখি—যে সব শিশু কথা বলিতে পারে না, তাহাদের গলায় লেবেল ঝুলিতেছে। উহাতে বিস্তারিত নাম-ঠিকানা লেখা রহিয়াছে। যদি কেহ হারাইয়া যায়, নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় পৌছাইবার ব্যবস্থা হইবে।

একপাশে দেখিলাম, একটি বাঙ্গালী মহিলা যাত্রী বিষণ্ণ মুখে বসিয়া আছেন। তাঁহার পুরুষ সঙ্গীটি একজন ৬০।৬৫ বছরের বৃদ্ধ। তাঁহাদের সঙ্গে চারি-পাঁচটি নাবালক শিশু—মোটঘাটের সংখ্যাও প্রচুর, প্রায় বারো-তেরটা।

তখন যে অবস্থা, তাহাতে নিজেদেরই জাহাজে অক্ষত শরীরে ওঠা মুস্কিল। তাহাতে এ যেন আবার গোদের উপর বিস্ফোট! মুড়ি-মুড়কির টিন, শিল-নোড়া, মা-কালী ও লক্ষ্মী-সরস্বতীর বাঁধান ছবি, টুক্‌রী-বোঝাই ব্রহ্মদেশের চিহ্ন, বেতের

ট্রে, পানের ডিবা ইত্যাদি মহিলাটি তাঁহার কিছুই ছাড়িয়া আসিতে পারেন নাই।

জাহাজের কর্ম্মচারী এত জিনিষ লইয়া উঠিতে দিবেন না। কিন্তু মহিলাটির মৃদু প্রতিবাদ কানে আসিল, "সর্ব্বস্ব খুইয়ে যেতে হবে নাকি? ভাড়া দিয়ে আসিনি?"

সঙ্গী বৃদ্ধ ভদ্রলোক বিবেচক। ঝাঁঝালো সুরে জবাব দিলেন, "তবে উঠুক্ তোমার সর্ব্বস্ব, আর তুমি প'ড়ে থাক তোমার ছেলেমেয়ে নিয়ে! তখনই বলেছিলাম—লোকেরই জায়গা নেই, আবার জিনিষ!" বলার সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি লাথি মারিয়া এক-একটা করিয়া টুক্‌রী সিঁড়ির উপর হইতে ইরাবতী নদীতে ফেলিয়া দিলেন।

দর্শক ও যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই হাসিয়া উঠিল, কিন্তু আমি ইহার মধ্যেও খানিকটা করুণ রসের সন্ধান পাইলাম। সাহায্য করিতে গিয়াছিলাম যাত্রীদের—কিন্তু তামাসা দেখিয়া ফিরিতে হইল; কর্ম্মচারীরা জাহাজের ত্রিসীমানার মধ্যেও কাহাকেও যাইতে দেন না।

আবার বোমা

● প্রস্থানের সঙ্কল্প—জাহাজ-ঘাট হইতে আসিয়া সবেমাত্র ঘরের দুয়ারে পা দিয়াছি—হঠাৎ আবার সাইরেন বাজিয়া উঠিল।

সিঁড়ির গোড়াতেই একটা ট্রেঞ্চ ছিল, ঢুকিয়া পড়িলাম। পরক্ষণেই "বুম্-বুম্ বুম্" শব্দ কানে প্রবেশ করিল।

এবার সহরের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে বোমা পড়িতেছে। যাহোক্ ট্রেঞ্চে বসিয়াই মনে-মনে সঙ্কল্প করিলাম, যদি এ যাত্রা বাঁচিয়া যাই, তবে আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিব না—রেঙ্গুণ ছাড়িতেই হইবে। মিছামিছি জাপানী বর্ব্বরতার মুখে প্রাণটা দিয়া আর লাভ কি ?

'অল্-ক্লিয়ার' সঙ্কেত হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই ট্রেঞ্চ হইতে উঠিয়া পড়িলাম। এইবার প্রথম চিন্তা হইল, কেমন করিয়া রেঙ্গুণ ছাড়িতে পারি! ট্রেণে ওঠা অসম্ভব, আর উঠিতে পারিলেও ভীড়ের চাপে আর পিপাসায়, অর্দ্ধপথেই হয়ত শেষ নিঃশ্বাস ফেলিতে হইবে।

এক বন্ধুর কথা মনে পড়িল—সে এক মস্ত-বড় ব্যবসায়ী—মোটর আছে। স্ত্রী-পুত্র সে পূর্ব্বেই দেশে পাঠাইয়া দিয়াছে—ভাগ্যবান্ পুরুষ সে। স্থির করিলাম, তখনই একবার তাহার খোঁজ লইতে হইবে। দেখি—সে আছে কিনা!

ছুটিলাম ফ্রেজার ষ্ট্রীটে। দেখিলাম, বন্ধুর দোকানের সম্মুখেই তখন মোটর দাঁড়াইয়া আছে, আর বন্ধুটি ছুটাছুটি করিয়া উহাতে হোল্ড্‌অল্‌ ও স্যুট্‌কেশ ইত্যাদি উঠাইতেছে। চাহিয়া দেখি, পাশের দোকানটা চূরমার হইয়া গিয়াছে।

চোখাচোখি হইতেই বন্ধুবর আগাইয়া আসিয়া সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিল, "এখনো বেঁচে আছিস্‌ তাহ'লে!—বৌ আর ছেলেমেয়ে?"

সংক্ষেপে জবাব দেই, "ওরা নিজেদের পথ নিজেরাই দেখেছে। গেছে টাঙ্গুতে, এবার আমার পালা।"

—"তবে চট্‌ ক'রে উঠে ব'স্‌; আমি যাচ্ছি ম্যাণ্ডালে। দোকানের কর্ম্মচারীরা আগেই ভেগেছে। দোকানের মাল দোকানেই রইল—প্রাণটা ত' বাঁচাই! তারপর দেখা যাবে।" —বন্ধু এক নিঃশ্বাসে বলিয়া গেল।

"লোকেরই জায়গা নেই, আবার জিনিষ! পৃঃ ১৪

রেঙ্গুণ ত্যাগ

● মরণ-দৌড়—যাত্রার আয়োজন-পর্ব্ব শেষ করিতে আমার জন্য আর আধ ঘণ্টা সময় বেশী লাগিল। রাস্তায় পড়িয়াই দেখি, পিপীলিকা শ্রেণীর মত সারি-সারি মোটর-শ্রেণী ছুটিয়া চলিয়াছে; আরোহীদের চোখে-মুখে আতঙ্কের ছায়া সুস্পষ্ট। পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশু—ইউরোপীয়ান, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, ভারতীয় ও বর্ম্মী—প্রাণের ভয় সকলেরই সমান। সবগুলি মোটরই ছুটিতে চাহিতেছে ঊর্দ্ধশ্বাসে, কিন্তু সমরোপকরণবাহী মিলিটারী লরীগুলির জন্য তাহা সম্ভব হইতেছে না। তাহাদের দাবী সর্ব্বাগ্রে।

এক মিনিটকে মনে হইতেছে যেন এক যুগ! এতদিনে আজই যেন সকলে একযোগে হঠাৎ সময়ের মূল্য বুঝিতে পারিয়াছে। পেছনে রেঙ্গুণের দিক্ হইতে যেন কোন বিরাট দৈত্য তাড়া করিয়াছে—একটুখানি থামিলেই সে ধরিয়া ফেলিবে! কিন্তু তবু না থামিয়া উপায় নাই—বোঁ, বোঁ, বোঁ—সহসা মাথার উপরে আবার এরোপ্লেনের শব্দ!

চলন্ত গাড়ীখানি থামিয়া পড়িল মন্ত্রমুগ্ধের মত। আরোহীরা হুড়্ হুড়্ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল, তারপর দে ছুট,—বনে আগুন লাগিলে বনের পশুপক্ষীরা যেমন ভাবে ছোটে! কেহ গিয়া শুইয়া পড়িল রাস্তার পাশে, কেহ গাছের নীচে, কেহ

ঝোপের আড়ালে! রাস্তা পার হইয়া এরোপ্লেন তিনখানা চলিয়া গেল। বুঝিলাম, সেগুলি জাপানী বিমান নহে—ব্রিটিশ বিমান।

তখনই আবার একটা কর্ম্মব্যস্ত ভাব—আবার সুরু হইল কল-গুঞ্জন। আধ ঘণ্টা সময় নষ্ট হইল বটে। দুইটার সময় রওনা হইয়াছিলাম—সন্ধ্যা ছয়টায় পৌঁছিলাম পিন্‌তাজা।

বন্ধুবর ড্রাইভ্ করিতেছিল; বলিল, "আজ রাত্রিটা এখানেই বিশ্রাম করা যাক্, কি বলিস্? বড্ড পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছে।"

নিজে পেছনের সীটে দিব্যি নাক ডাকাইয়া আসিতেছিলাম; তবু দুপুর-রোদে টিমা-তেতালায় একটানা মোটর-হাঁকানো যে কতখানি বিরক্তিকর, তাহা আমার ধারণার বাইরে নহে। কাজেই বন্ধুর কথায় সাগ্রহে সায় দিলাম। কিন্তু সমস্যা হইল, থাকিব কোথায়? ডাকবাংলো কি খালি পাওয়া যাইবে? দেখাই যাউক।

● **পিন্‌তাজা ডাকবাংলোয়**—ডাকবাংলোর নীচে গিয়াই মোটর থামানো হইল। দেখা গেল, আরও দুইখানা মোটর-গাড়ী দাঁড়ানো আছে।

দেখিয়া দমিয়া গেলাম। বন্ধুটি কিন্তু সিঁড়ি বাহিয়া সোজা উপরে উঠিয়া গেল।

মিনিট পাঁচেক পর নামিয়া আসিয়া বলিল, "চল্, ডাক-বাংলোর বারান্দাই আজ রাত্রির মত নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। দুটো ঘরই সাহেব-মেমরা দখল ক'রে ব'সে আছে।"

প্রশ্ন করিলাম, "বারান্দায় থাকতে দিতে ওরা আপত্তি করে নাই ত' ?"

—"আর আপত্তি! বিপদে গায়ের রঙের পার্থক্য-বোধটা সম্ভবতঃ ওদের ঘুচে গেছে। তা ছাড়া, আপত্তি করলেই বা শুনত কে? গাছতলায় থাক্‌ব নাকি?"

যুক্তি অকাট্য—না মানিয়া উপায় কি? বারান্দার একটা কোণ দখল করিয়া পরিপাটি বিছানা করা গেল।

বন্ধুবর বোধ হয় যাদু জানে! একটু পরেই দেখি—সাহেবদের বয়্‌ আসিয়া ট্রেতে করিয়া দুই কাপ চা ও কেক্‌-বিস্কুট দিয়া গেল। আমার বিরাট স্যুটকেসটা টেবিলের স্থান অধিকার করিল।

গদগদ চিত্তে সাহেবদের সহৃদয়তার প্রশংসা করিতে যাইতেছিলাম, বন্ধু বাধা দিয়া বলিল, "থাম্‌ থাম্‌, ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে এদের একজনের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে—তাই এ খাতির।"

দুই বন্ধুতে মিলিয়া সান্ধ্যভোজটা রেলওয়ে-ষ্টেশনের রিফ্রেশমেণ্ট-রূম হইতে সারিয়া আসিলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখি—ডাকবাংলোর বারান্দার অন্য কোণটায় আর-একটি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পরিবার বিছানা ফেলিয়াছে। আব্রু-রক্ষার জন্য একটা সবুজ পর্দ্দাও তাহারা ঝুলাইয়া দিয়াছে।

এদিকে টেবিলের উপরে মস্ত-বড় একটা গ্রামোফোন বাজিতেছে। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এক যুগল সাহেব-

যেমও তালে-তালে নাচিয়া বেড়াইতেছে। আর সকলে টেবিলের চারিধারে ফিরিয়া-বসিয়া নাচ-গানটা উপভোগ করিতেছে পূর্ণ-মাত্রায়। ইহাদের একজন আবার টেবিলের উপর মৃদু করাঘাত করিয়া তাল-জ্ঞানের পরিচয় দিতেছে। কে কোথায় চলিয়াছে, কবে কোথায় বোমা পড়িয়াছে, কাহারও যেন মনেও নাই, এমনি নিশ্চিন্ত ভাব! এই ত'—

"জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন!"

কখন এক সময় ঘুমাইয়া পড়িলাম—আর উঠিলাম ভোর পাঁচটায় বন্ধুবরের ডাকাডাকিতে।

আবার ছুটিতে হইবে। মনে পড়িয়া গেল—জাপানী দৈত্যটা ছুটিয়া আসিতেছে। কানের কাছে যেন আবার স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম—বুম-বুম-বুম—বোমা ফাটিতেছে! দুই কানে আঙুল গুঁজিয়া দিলাম, কিন্তু তবু যেন সেই শব্দ!

● **টাঙ্গু**—খুব সকাল-সকালই টাঙ্গু পৌঁছান গেল। বন্ধুটিকে একদিনের জন্যও আটকাইয়া রাখা গেল না—দোকানের একটা ব্যবস্থা করিতে যত শীঘ্র সম্ভব তাহাকে ম্যাণ্ডালে পৌঁছিতে হইবেই।

টাঙ্গু আমি পূর্ব্বেও একাধিকবার দেখিয়াছি, কিন্তু সে টাঙ্গু আজ আর নাই। ঘোড়দৌড়ের ময়দান ও খেলার মাঠ জুড়িয়া মিলিটারী ব্যারাক তৈয়ার হইয়াছে। রাস্তায়-রাস্তায় গোরা ও দেশী সৈন্য টহল দিয়া ফিরিতেছে। পিচের রাস্তার উপরই ট্যাঙ্ক

চালাইয়া গোরারা পরখ করিয়া দেখিতেছে। বড় রাস্তার কোণে দেখি, একটা বিমান-বিধ্বংসী কামান ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে! এই রকম আর কয়টা আছে, কে জানে? একটা বড় স্কুলকে করা হইয়াছে মিলিটারী হাসপাতাল। কয়েকটা নূতন বিল্ডিং উঠিয়াছে—উহাতে নানা রকম মিলিটারী অফিস!

বাজার আর দোকানপাটের চেহারাও বদলাইয়া গিয়াছে—দোকানদারদের যেন চৈত্-পরব্! এই সুযোগে যা কিছু করিয়া লইতে পারে! এদিকে কিন্তু সহরবাসীরা সকলেই সন্ত্রস্ত—যে কোন মুহূর্ত্তে জাপানী বোমারুদের টিকি দেখা যাইতে পারে! ইতিমধ্যেই দুই-একদিন সাইরেন বাজিয়াছে। তাহার ফলে কেহ-কেহ সহর ছাড়িয়াও চলিয়া গিয়াছে।

টাঙ্গুতে বহুদিন যাবৎ নিক্কো নামে একজন জাপানী ফটোগ্রাফার ছিল। গুজব রটিয়াছে—সে নাকি জাপানে ফিরিয়াই রেডিও-মারফত খবর দিয়াছে, শীঘ্রই টাঙ্গু সহরে বোমা ফেলিবে। এ না হইলে আর নিমকহারামীর পরিচয়টা কেমন করিয়া দেওয়া যায়?

● ইদাসী—এখন দেখিতেছি টাঙ্গুতে থাকাও নিরাপদ নয়। ইদাসী নামক একটি ছোট সহরের পোস্ট-মাস্টার আমার স্ত্রীর আত্মীয়। তিনি উচ্চশিক্ষিত ও একজন সাহিত্যিক গোছের লোক। ইদাসী সহরটা টাঙ্গু হইতে মাত্র ষোল মাইল দূরে। দিন-সাতেক পর একদিন তল্পীতল্পা গুটাইয়া সেইখানে গিয়া উঠিলাম।

পোষ্ট-মাষ্টার আমাদিগকে দেখিয়া যেন হাতে আকাশ পাইলেন! সহরে মাত্র আর একটি বাঙ্গালী পরিবার আছে; কিন্তু তাহারা থাকে পোষ্টাফিস হইতে খানিকটা দূরে। দুর্দ্দিনে সঙ্গী কে না চায়? তারপর আবার নিকট-আত্মীয়।

হঠাৎ খবর পাওয়া গেল—মৌলমিন, টেভয় ও মার্ত্তাবান সহরগুলি জাপানীরা দখল করিয়াছে, আর যুদ্ধ নাকি ক্রমেই আগাইয়া আসিতেছে পেগুর দিকে। আর অন্যদিকে রেঙ্গুণেও অনবরত বোমাবর্ষণ চলিতেছে।

আমাদের মুখ গেল শুকাইয়া—কাচ্চা-বাচ্চা লইয়া এখন যাই কোথায়? উপর দিকে এখনও কতকটা নিরাপদ; কিন্তু নিরাপদ হইলেও সকল স্থানে যাওয়ার সুবিধা হয় না।

মৌলমিন ও পেগু-অঞ্চলের ভারতীয় অধিবাসীরা দলে-দলে পলাইয়া আসিয়া ছোট-ছোট সহরে আশ্রয় লইতে লাগিল। বাজারে জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়া গেল—অনেক অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ-সংগ্রহ দুর্ঘট হইয়া উঠিল। দুশ্চিন্তার কালো মেঘ আমাদের মুখে ঘনাইয়া আসিল—এখন করি কি?

স্ত্রী-পুত্র সঙ্গে না থাকিলে ভয় এতটা ছিল না—এদের লইয়াই যত বিপদ। অবস্থা যা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে রেঙ্গুণও নিরাপদ নয়, সমুদ্র-পথও নিরাপদ নয়; কিন্তু তবু ঠিক করিলাম—মরিয়া হইয়া একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব ছেলেমেয়েদিগকে যাহাতে জাহাজে করিয়া দেশেই পাঠাইয়া দিতে পারি।

আহত সৈন্যদের এম্বুলেন্স স্পেশাল গাড়ীগুলি মাঝে-মাঝে

ইদাসী ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়ায় এবং ট্রেণের নানা গোলযোগের জন্য কখন-কখন তিন-চার ঘণ্টা অপেক্ষা করে। দেখি, তিনজন আহত সৈন্য পোষ্টাফিসের কম্পাউণ্ডে ট্রেণের নিকট আমগাছের নীচে আসিয়া বসিয়াছে।

উহারা যে খুব গুরুতর আহত, তাহা মনে হইল না। এক-জনের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতে, একজনের হাঁটুতে, আর-একজনের কপালে চোখের কাছে। পোষ্টাফিসের কাজকর্ম্ম ত' এক-প্রকার বন্ধই—তার উপর সেদিন রবিবার। আমরাও গিয়া উহাদের নিকট বসিলাম—উদ্দেশ্য, যুদ্ধের গল্প শুনিব।

সৈন্য তিনজনের একজন পাঞ্জাবী মুসলমান। মনে হইল কিছু লেখাপড়াও জানে, তবে নিজের বাহাদুরী দেখাইবার ঝোঁকটাই যেন বেশী! এ পর্য্যন্ত সে নাকি একাই সাতটা জাপানীকে বন্দী করিয়াছে! তাহার সর্ব্বশেষ বারত্বের গল্পটা এইখানে তাহার নিজের জবানীতেই বলিতেছি:

সেলুইন নদীর তীর। এপারে আমাদের সৈন্য, ওপারে জাপানী। কাল—সন্ধ্যা। একটা উঁচু টিলার উপর দাঁড়াইয়া আমাদের একজন সশস্ত্র সিপাহী ওপারের দিকে মুখ করিয়া পাহারা দিতেছে। পাহাড়ী নদী সবেগে কল্‌কল্‌ করিয়া বহিয়া চলিয়াছে।

রাত্রির অন্ধকারে নদী পার হইয়া আক্রমণ চালানো উভয় দলের পক্ষেই অসম্ভব। সারাদিনের পরিশ্রমের পর আমরা সকলেই ক্ষুৎ-পীড়িত। ঝোপের আড়ালে-আড়ালে রান্না-বান্না

সুরু হইয়াছে। আমি মাটির উপর সটান শুইয়া পড়িয়া আকাশের তারা গুণিতেছি। সহসা আমাদের পেছনে জঙ্গলটা হইতে গুলি-বর্ষণ আরম্ভ হইল—ট্যাট্যা—ট্যাট্যা—ট্যা! মেশিন-গানের আর্ত্তনাদ!

আমাদের কে কি করিতেছে বুঝিতে পারিলাম না। অন্ধকারে আবার রাইফেলটাও খুঁজিয়া পাইলাম না। কোমরের বেল্টে বাঁধা শুধু একটা রিভলভার।

হামাগুড়ি দিয়া অগ্রসর হইলাম—কোন্‌দিকে যাইতেছি কিছুই ঠাহর হইল না। হঠাৎ কথাবার্ত্তার আওয়াজে টের পাইলাম, ভুলক্রমে জাপানীদের কাছেই আসিয়া পড়িয়াছি। দে ছুট্‌, দে ছুট্‌,—আবার উল্টাদিকে!

শুক্‌না পাতার খস্‌খস্‌ শব্দে একটা জাপানী ছুটিয়া আসিল। নিজেকে আমি মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দিলাম। লোকটা যখন আমার হাত তিনেক দূরে, তখন হঠাৎ তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িলাম। রিভলভারের বাঁটের একটা ঘা দিতেই লোকটা অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

তখন লোকে যেমন করিয়া মড়া কুকুরের লেজ ধরিয়া টানিতে-টানিতে তাহাকে নর্দ্দমায় ফেলিতে লইয়া যায়, আমিও সেইভাবে তাহার ঠ্যাং ধরিয়া টানিতে-টানিতে উর্দ্ধশ্বাসে একদিক লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া চলিলাম।

ছুটিতে-ছুটিতে কখন হয়ত অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম! এক-সময়ে চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখি, আমি নিজের দলের

মধ্যেই আছি! বরাত ভাল বলিতে হইবে। বলাই বাহুল্য, দলপতির কাছ হইতে অজস্র প্রশংসা-লাভ ঘটিল।

বন্দী জাপানীটার মুখে শুনিলাম- আমরা যখন বিশ্রামের আয়োজনে ব্যস্ত, তখন জঙ্গলের আড়ালে-আড়ালে মাইলখানেক গিয়া উহারা রবারের সেতুতে নদীটা পার হয় এবং অন্ধকারে গা ঢাকিয়া পিছন হইতে আমাদের আক্রমণ করে। আমাদের দলের অর্দ্ধেকের বেশী লোক সেদিন উহাদের হাতে মারা পড়িয়াছিল।

গল্পগুজবে আরও খানিকক্ষণ সময় কাটিল, তারপর চা পান করাইয়া সৈন্য তিনজনকে বিদায় দিলাম।

আবার রেঙ্গুনে

● **ষ্টেশনে অসহায়**—ইহার দুইদিন পরে শ্রীহরের কাছে রেঙ্গুণে একটা এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম করিলাম। জানাইলাম, ছেলেমেয়ে সহ জাহাজে দেশে রওনা হইবার জন্য পরের দিনই ভোরের ট্রেণে আমরা রেঙ্গুণ পৌছিব—সে যেন ষ্টেশনে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে।

শ্রীহরদের অফিস তখনও অন্যত্র সরাইয়া লওয়া হয় নাই। তবে শ্রীহর আর সহরে থাকে না, সে থাকে কামায়ুটে—সহরের বাইরে মাইল দশেক দূরে।

রাত্রি আটটায় ইদাসী হইতে ট্রেণে উঠিলাম। রেঙ্গুণগামী গাড়ীতে ভীড় নাই। এখন আর রেঙ্গুণের দিকে সহজে কেহ যায় না, কিন্তু তবু মস্ত অসুবিধা—ট্রেণ-চলাচলে নানারকম বিশৃঙ্খলা। গার্ড, ড্রাইভার—অনেকেই কাজে ইস্তফা দিয়া, এদিক-ওদিক সরিয়া পড়িয়াছে। পরের দিন ভোর সাড়ে ছয়টায় আমাদের গাড়ী রেঙ্গুণ পৌঁছিবার কথা, কিন্তু সে গাড়ী গিয়া পৌঁছিল বিকাল সাড়ে পাঁচটায়।

ষ্টেশনে শ্রীহরের দেখা পাইলাম না। বড়ই দুশ্চিন্তায় পড়িলাম—এখন যাই কোথায়? রেঙ্গুণে যে দুই-একজনের সঙ্গে জানাশুনা ছিল, নিশ্চয়ই তাহারা সকলেই সহর ছাড়িয়া—হয় দেশে, না হয় অন্য কোন নিরাপদ স্থানে চলিয়া গিয়াছে।

প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতেছি এমন সময়ে হঠাৎ সাইরেণ বাজিয়া উঠিল। ষ্টেশনের কর্ম্মচারীরা যে যেদিকে পারিল, ছুটিয়া গিয়া ট্রেঞ্চে আশ্রয় লইল।

কুলীরাও জিনিষপত্র ফেলিয়া গর্ত্তে গিয়া ঢুকিল। আমার সঙ্গে পাঁচটি ছেলেমেয়ে—তা ছাড়া স্ত্রী, স্ত্রীর একটি ভাই—নাম তার সরোজ, আর একজন মাদ্রাজী আয়া। ছেলেমেয়েদের মাঝে সবচেয়ে ছোট একটি মেয়ে, মেয়েটির বয়স মাত্র পনেরো দিন। কাজেই আমার অবস্থাটা সহজেই অনুমেয়।

সকলে মিলিয়া ঠুঁটো জগন্নাথের মত এক কোণে দাঁড়াইয়া রহিলাম—যা থাকে কপালে! এ ছাড়া আর উপায় কি? যা হোক্, ইতিমধ্যে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলাম।

আশ্রয়-লাভ—কিছুক্ষণ পরেই 'অল্-ক্লিয়ার' সঙ্কেত হইল। আমি তৎক্ষণাৎ চতুর্গুণ মূল্যে একটা ঘোড়ার গাড়ী ঠিক করিয়া বাঙ্গালী-প্রতিষ্ঠান দুর্গা-বাড়াতে যাইয়া উঠিলাম।

সেখান হইতে চাকর-বাকর সব ভাগিয়া গিয়াছে, একমাত্র পুরোহিত-ঠাকুর মহাশয় তখন পর্য্যন্ত সাহসে বুক বাঁধিয়া দৈনিক পূজাপাঠ চালাইয়া যাইতেছেন। তিনি সানন্দে আমাদের জন্য অতিথিশালার সবচেয়ে ভাল ঘরটি খুলিয়া দিলেন।

ভগবানকে ধন্যবাদ! ইহা না হইলে ব্ল্যাক্ আউটের রাত্রিতে অর্দ্ধ-পরিত্যক্ত রেঙ্গুণ সহরে কোথায় গিয়া দাঁড়াইতাম?

রাত্রিতে কিন্তু ঘুমাইতে পারিলাম না। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া

সহরের কোন্ দিকে যেন বোমা পড়িল ! চার-পাঁচবার দোতলা হইতে নীচতলায় নামিয়া ঘরের মেঝের ট্রেঞ্চে আশ্রয় লইলাম এবং এই করিয়াই রাত্রি ভোর হইল।

পরদিন বেলা দশটায় অফিসে গিয়া শ্রীহরের সঙ্গে দেখা করিলাম এবং আর-একদফা জিনিষপত্র বাঁধিয়া-কষিয়া শ্রীহরের বাসায় গিয়া উঠিলাম।

ইহার পর তিনদিন গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া ছুটাছুটি করিলাম জাহাজের টিকেটের জন্য; কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। এদিকে সহরের প্রায় সমস্ত ভাল দোকান-পাটগুলিই বন্ধ—দুধ, মাছ, তরিতরকারী পাওয়া যায় না। ডাল-চাউল যাহা পাওয়া যায়, তাহাও কদর্য্য।

ছেলেমেয়েগুলি অসুখে পড়িল। আর পারা যায় না—হাল ছাড়িয়া দিয়া আবার ইদাশী ফিরিয়া যাওয়াই মনস্থ করিলাম। ভাবিলাম, জাপানীরা যদি দেশটা দখল করিয়া বসে, তবে হয়ত আর স্বদেশের মুখ দেখিবার সৌভাগ্যই হইবে না। কিন্তু, তবু এখন আর উপায় কি ?

আবার ইদাসীতে

● **জনস্রোত**—চতুর্থ দিনে আধমরা অবস্থায় ফিরিয়া আসিলাম আবার ইদাসীতে। ইদাসীর আশে পাশে তখন অনন্ত জনস্রোত। শুনিলাম, দলে দলে লোক হাঁটাপথেই রওনা হইয়েছে ভারতবর্ষের দিকে। কোন দল প্রোম-লাইনে আকিয়াব হইয়া যাইবে, আর কোন দল যাইবে মনওয়া হইয়া মণিপুরের মধ্য দিয়া! দেখি—উড়িয়া কুলীর এক মস্ত দল আসিয়া পোস্ট-অফিসের সম্মুখে রাস্তার পাশেই রাত্রির মত আশ্রয় লইয়াছে—ভোরেই আবার তাহাদের যাত্রা সুরু হইবে। উহারা আসিয়াছে পেগু হইতে।

পোষ্ট-মাস্টারবাবু নির্বিকার—নিজেকে অদৃষ্টের হাতে ছাড়িয়া দিয়া দিব্যি কাজকর্ম্ম করিয়া যাইতেছেন। ডিপার্টমেণ্টাল কোন নির্দ্দেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত তিনি নড়াচড়া করিতে পারেন না—Duty is duty (ডিউটি ইজ্ ডিউটি)! তবে আমাদের সম্বন্ধে তিনি নিশ্চেষ্ট রহিলেন না।

ইদাসীর মাইল তিনেক দূরে মিনেবি নামক গ্রামে প্রায় দেড়শ' ঘর হিন্দুস্থানী আসিয়া আস্তানা গাড়িয়াছে। শুনিলাম, সেইখানে আমাদের জন্য তিনি একটা ঘরের বন্দোবস্ত করিতেছেন। হাঁটাপথ এমনই দুর্গম আর বিপদ-সঙ্কুল যে, সে পথে পা বাড়ানো নাকি মহাযাত্রারই সামিল! বিশেষ করিয়া কাচ্চাবাচ্চাসহ আমার মত পরিবারের পক্ষে।

● **গুজবের ভীতি**—ইতিমধ্যেই রাস্তার বিপদ সম্বন্ধে নানা প্রকার ভীতিপ্রদ গুজব-রটনা সুরু হইয়াছে। শত-শত লোক নাকি কলেরায় মরিতেছে—ডাকাতেরা টাকা-পয়সা লুটিয়া লইতেছে—পাহাড়া নাগা ও কুকীরা বনের আড়াল হইতে বিষাক্ত তীর ছুঁড়িয়া পেট ফুটা করিয়া দিতেছে—জলের অভাবে গলা শুকাইয়া স্থানে-স্থানে পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়াই লোকেরা মরিয়া আছে—এক ঘটি জলের দাম পঞ্চাশ টাকা, তাও নাকি দুর্ঘট—ইত্যাদি ইত্যাদি।

যাহারা একবার রওনা হইয়া গিয়াছে, তাহাদের এক-জনকেও কেহ ফিরিয়া আসিতে দেখে নাই। তবে এই সমস্ত খবর কেমন করিয়া প্রচারিত হয়, কে জানে? তবু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, লোকে ইহা বিশ্বাস করে, আর এই লইয়া জটলা করে। কিন্তু তাহার দুইদিন পরেই আবার দল বাঁধিয়া রওনা হয় এই মহাপ্রস্থানেরই পথে!

● **বোমার গর্জ্জন**—আজ ২রা ফেব্রুয়ারী। ভোরের দিকে **'চিড'** নামক একটি পরিত্যক্ত এরোড্রোমে বোমা-বর্ষণ হইল।

জায়গাটা এখান হইতে দশ মাইল দূরে। তবু এত দূর হইতে গোটা-চারেক বোমা-ফাটার আওয়াজে সকলেই বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলাম। কিন্তু আশ্চর্য্য! আমার মনে যেন কোন উদ্বেগই অনুভূত হইল না! ব্যাপারটা যেন গা-সহা হইয়া গিয়াছে! বলিতে কি, আমার মনে-মনে এই ইচ্ছাও সময়-সময়

হইত—চোখের সামনেই যদি একটা বোমা ফাটিতে দেখিতে পাইতাম।

৪ঠা তারিখে বিকালের দিকে চিড'তে আবার কয়েকটা বোমা পড়িল, কয়েকখানা জাপানী বিমান আমাদের ঘরের উপর দিয়াই উড়িয়া গেল। আমাদের কয়েকখানা বিমানও উহাদের তাড়া করিল দেখিতে পাইলাম।

আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায় না—ছেলেমেয়েগুলি আতঙ্কে বিহ্বল। না, একটা কিছু করিতেই হইবে।

● **আশ্রয়ের খোঁজে**—পরের দিন ভোরেই পোষ্ট-মাষ্টারকে লইয়া মিনেবি গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সারি-সারি খড়ের ঘর বাঁধিয়া হিন্দুস্থানী পরিবার বাস করিতেছে। চাষ-আবাদ করিয়া ইহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। দুই-একজনের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল,—মস্ত-মস্ত ধানের গোলা, গোয়ালে ত্রিশ-চল্লিশটা করিয়া দুগ্ধবতী গাভী। প্রায় শ'দেড়েক পরিবারই বটে।

গ্রামের মাতব্বর মেঘাসিং ও বিজলীসিং দুই ভাই আগাইয়া আসিয়া "রাম রাম বাবুজী", বলিয়া অভ্যর্থনা করিল।

জোয়ান পালোয়ানের মত তাহাদের চেহারা, কালো মিশ্‌মিশে গায়ের রঙ, মাথার চুল ছোট-ছোট করিয়া ছাঁটা, মুখের ভাব নির্ভীক্।

আমাদের দুইজনকে দুইটা বেতের মোড়ায় বসিতে দিয়াই তাহারা বাড়ীতে সরবৎ তেয়ার করিতে বলিয়া দিল। নিজেদের

জমির আখ হইতে প্রস্তুত গুড় আর ঘরে-পাতা দই, এই দুইয়ের মিশ্রণে সরবৎ প্রস্তুত হইল, আমরা পরম তৃপ্তির সঙ্গেই তাহা পান করিলাম।

আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য উহাদের জানা ছিল; তাহারা অভয় দিয়া বলিল, "সহরে গোলমাল হ'লে পরিবার এখানেই পাঠিয়ে দেবেন বাবুজী! যদি বলেন, আজই আপনাদের জন্য একটা ঘর বাঁধতে লেগে যাই। এ জঙ্গলে বোমা পড়বে না, সে ভয় নাই; আর গুণ্ডারাও এদিকে ঘেঁষতে সাহস করবে না! আমরা যে লাঠি-বর্শা চালাতে জানি, এ অঞ্চলে কারো তা অজানা নাই!"

ধানের গোলার নীচে একজায়গা হইতে লুকানো কতকগুলি বর্শা ও তরোয়াল আনিয়া উহারা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিল; বলিল, "এই দেখুন, আমরা কতটা হুঁসিয়ার আছি!"

অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম। দুই ভাইকে লইয়া গ্রামটা একবার ঘুরিয়া আসিলাম। গ্রামে ছোট ছেলেমেয়ের সংখ্যাও কম নয়! একটা হিন্দু স্কুলও আছে।

মেঘাসিং ও বিজলীসিং এ যাবৎ বিবাহ করে নাই। বিবাহের বয়স উহাদের পার হইয়া গিয়াছে কিন্তু উপায় কি? এ অঞ্চলে উহারাই একমাত্র ছত্রী; অন্যান্য বাসিন্দারা সকলেই আহীর বা গোয়ালা। নীচু জাতে বিবাহ করিয়া উহারা ধর্ম্ম নষ্ট করিতে পারে না। বংশ না থাকুক, তাহাতে আর কি যায় আসে?

'আর দ্বিতীয় কথা বলবে ত' গুলি করব।"

পৃঃ ৫৫

যাহা হউক, দুই ভাইয়ের হাতে পাঁচটি টাকা দিয়া আসিলাম। বলিয়া দিলাম, শীঘ্রই যেন আমাদের জন্য একটা ঘর তৈয়ার করিয়া রাখে। টাকা আর যা লাগে, পোষ্টম্যানকে দিয়া পাঠাইয়া দিব।

মন হইতে অনেকখানি দুশ্চিন্তার ভার হয়ত নামিয়া গিয়াছিল; কিন্তু ইদাসী ফিরিয়া যাহা শুনিলাম, তাহাতে ঐ মিনেবি গ্রামেও পরিবার পাঠাইতে ভরসা হইল না। কারণ, একজন স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্রলোকের মুখে শুনিলাম, মেঘাসিং ও বিজলীসিং নিজেরাই গুণ্ডা। ডাকাতি করার অপরাধে দুই-তিন বার জেলও নাকি উহারা খাটিয়াছে।

কথাটা শুনিয়া আবার হাল ছাড়িয়া দিতে হইল।

● আবার বোমা! ঘরের কাছে—১৮ই ফেব্রুয়ারী পিনমানা সহরে বিমান-আক্রমণ হইয়াছে খবর পাওয়া গেল। ২৪শে ফেব্রুয়ারী ছোওয়া নামক একটি ক্ষুদ্র সহরে বোমা পড়িল। ইদাসী হইতে ছোওয়া মাত্র আট মাইল দূর। বোমার আওয়াজ আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম, আমাদের ঘরের কাচের জানালাগুলি ঝন্‌ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। ট্রেঞ্চ হইতে মাথা তুলিয়া দেখি, ছোওয়ার দিক হইতে ধূম্র-কুণ্ডলী উঠিয়া আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

ছোওয়াতে কোন মিলিটারী ঘাঁটি বা এরোড্রোম নাই। উহাকে সহর না বলিয়া একটা পাড়াগাঁ বলিলেও চলে। অনর্থক

নিরীহ লোকদিগকে হত্যা করাই হয়ত জাপানীদের উদ্দেশ্য। নতুবা এমন জায়গায় বোমাবর্ষণের ইহা ছাড়া আর কোন মানে হয় না। বুঝিলাম, এইবার বোমা আসিয়া পড়িল বাড়ীর কাছে, একরকম ঘরের দুয়ারে! দেখি, পোষ্ট-মাষ্টারেরও মুখ শুকাইয়া উঠিয়াছে!

যাত্রাপর্ব্ব

● **অপ্রত্যাশিত বন্ধু**—২৬শে ফেব্রুয়ারী। সহরের লোকজন সব বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। বাজার বন্ধ। প্রায় ছয় মাসের আন্দাজ চাউল-ডাল ইত্যাদি কিনিয়া রাখিয়াছি—বাজারে যাইবার প্রয়োজনও নাই। স্থির করিলাম, চা খাইয়া একবার রেলওয়ে-ষ্টেশনে যাইব। ষ্টেশন-মাষ্টার একজন মাদ্রাজী ভদ্রলোক, তিনি নাকি রাস্তার খবরাখবর লইতেছেন এবং পলাইবার মতলবে আছেন।

সহসা ক্রীং, ক্রীং, ক্রীং!

ঘরের বাইরে সজোরে সাইকেলের বেল্ বাজিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে দরজায় করাঘাত!

পোষ্ট-মাষ্টারবাবু গিয়া দরজা খুলিয়া দিতেই শুনিতে পাইলাম, কে প্রশ্ন করিল, "মনোরঞ্জনবাবু আছেন? মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী?"

পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া ছুটিয়া গিয়া দেখি—হরেন সেন ও ডি, কে, সেন।

আমাকে দেখিয়াই হরেন সেন বলিয়া উঠিলেন, "যা ভেবেছি ঠিক তাই! বর্ম্মার হাতে একটা ব্রহ্মহত্যা হ'ত আর কি? এখনো চুপ ক'রে ব'সে আছেন?"

বলিলাম, "ব'সেই আছি। আর একাও নই—স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সকলেই আছে, উপায় ত' কিছু দেখছিনে!"

ডি, কে, সেনের দিকে চাহিয়া, একটু হাসিয়া হরেন সেন বলিলেন, "ঠাকুর ভোগাবে দেখ্‌ছি!"

তারপর আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "চলুন জিনিষপত্র বেঁধে নিন, আর এক মুহূর্ত্তও দেরী নয়; জাপানীরা পেগু ছেড়ে হ্ল্যাংলবিন পর্য্যন্ত এসে পড়েছে!"

হাতে যেন আকাশ পাইলাম! সেনবাবুকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম, "আপনারা না এলে এখানেই কচুকাটা হয়ে মরতে হ'ত।"

হরেন সেন ও আমি একসঙ্গে রাজসাহী কলেজে পড়িতাম এবং একসঙ্গেই পি, এন, হোষ্টেলে থাকিতাম। এতগুলি ছেলের মধ্যে সেখানে একমাত্র সেনবাবুই ছিলেন আমার সব সময়ের সঙ্গী। কলেজের বোটে বাইচ খেলিতাম একসঙ্গে—আবার সাঁতরাইয়া পদ্মানদী পারও হইতাম একসঙ্গে।

কয়েক বছর পূর্ব্বে রেঙ্গুণের রাস্তায় একদিন হঠাৎ আবার সেনবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হয়। সেনবাবু তখন মস্ত-বড় একজন কণ্ট্রাক্টর—ডি, কে, সেন তাঁহার একজন পার্টনার। ইহার পর হইতে আমরা উভয়েই পরস্পরের খোঁজ-খবর লইতাম, এবং সুযোগ পাইলেই দেখা-সাক্ষাৎ করি।

সেনবাবু চিরকুমার—মুক্ত পুরুষ। না করিতে পারেন এমন কাজ নাই। যেমন গায়ের জোর তেমনই কষ্ট-সহিষ্ণু।

তাঁহাকে হাতে পাইয়া মনটা আমার পাখীর পালকের মত হাল্কা হইয়া গেল! আমাদের শাস্ত্রে আছে—দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে আর শ্মশানে যে সহায় হয়, সে-ই প্রকৃত বন্ধু। কথাটা এতদিনে হৃদয়ঙ্গম করিলাম—রাষ্ট্রবিপ্লবে পাইলাম সেনবাবুকে।

● **মহাপ্রস্থানের প্রোগ্রাম**—সেনবাবু রাস্তাঘাটের খবর লইয়া একরকম প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলেন। কাজেই মহা-প্রস্থানের প্রোগ্রাম ঠিক হইয়া গেল। স্থির হইল, ইদাসী হইতে ট্রেণে যাইব মিনজান; মিনজান হইতে ষ্টীমারে মন্ওয়া হইয়া কালেওয়া; কালেওয়া হইতে হাঁটাপথে মণিপুর হইয়া ডিমাপুর। তারপর আর কি! ট্রেণে যার যথা দেশ। অবশ্য হাঁটাপথটা পর্য্যন্ত প্রাণটা যদি দেহে থাকে!

প্রথম সমস্যা হইল, ট্রেণে জায়গা পাওয়া যায় কিরূপে? স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, জায়গা পাওয়া ত' দূরের কথা, ইদাসী ষ্টেশন হইতে ট্রেণেই উঠা যাইবে না!

ষ্টেশন-মাষ্টারকে গিয়া ধরিলাম—একটা উপায় করিতেই হইবে। ষ্টেশন-মাষ্টার বলিলেন, "কোন চিন্তা নাই, একটা গোটা 'ওয়াগন্' আপনাদের দিচ্ছি। খাওয়া-দাওয়া সেরে জিনিষপত্র নিয়ে উঠে পড়ুন, ট্রেণ এলেই ওর সঙ্গে জুড়ে দিব।'

ষ্টেশন-মাষ্টার যে উপকারটুকু করিলেন, টাকায় তাহার দাম হয় না; তবু টাকা তাঁহাকে দিতে চাহিলাম, কিন্তু একটি

পয়সাও তিনি আমাদের কাছ হইতে লইলেন না, অথচ এই এক-একটা ওয়াগনের জন্য চীনা-ব্যবসায়ীদের কাছ হইতে এখন তিনি না চাহিতেই ষাট-সত্তর টাকা পান।

আমরা বেলা বারোটার সময় খাওয়া-দাওয়া সারিয়া ওয়াগনে উঠিয়া বসিলাম। পোষ্ট-মাষ্টার মহাশয় তখনও কোন অর্ডারই পান নাই—তিনি কিছুতেই আমাদের সঙ্গে যাইতে রাজী হইলেন না। বলিলেন, তিনি ও ষ্টেশন-মাষ্টার এক সঙ্গেই রওনা হইবেন যত শীঘ্র পারেন—এবং সম্ভব হইলে, আমাদের সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইবেন।

একজন হিন্দুস্থানী পোষ্টম্যান ইন্দ্রদেও সিং এবং সপরিবারে একজন বাঙ্গালী পোষ্টম্যান শচীন্দ্র দে, আমাদের সঙ্গে চলিল। পোষ্ট-মাষ্টার মহাশয় উহাদের আটকাইলেন না।

সমস্ত দিন গেল, কোন ট্রেণ আসিল না। রাত্রি দশটায় একটা ট্রেণ আসিল এবং আমাদের ওয়াগনটা তাহাতে জুড়িয়া দেওয়া হইল। গার্ড ও ড্রাইভারকে দশ টাকা করিয়া বক্‌শিস্ দিতে হইল; কারণ, গাড়ীটা এত লম্বা যে, ইঞ্জিন আর যেন টানিতে পারিতে ছিল না! এই ক'টা টাকা না দিলে ড্রাইভারকে রাজী করানো যাইত না।

মহাপ্রস্থান

● **রেলপথে ইদাসী হইতে মিনজান**—গাড়ী ছাড়িল। এই এত রাত্রি পর্য্যন্ত পোষ্ট-মাষ্টার মহাশয় আমাদের গাড়ার কাছে দাঁড়াইয়া ছিলেন। বিদায় লইতে গিয়া আমাদের সকলেরই চোখের কোণে জল দেখা দিল। আবার কবে দেখা হইবে, কখন্ দেখা হইবে, দেখা হইবে কিনা—কে জানে ?

গাড়ী এক-একটা ষ্টেশনে অনেকক্ষণ করিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। পরের দিনটাও গাড়ীতেই কাটিল। ২৮শে ফেব্রুয়ারী দিন দশটায় মিনজান পৌঁছিলাম। ষ্টেশনে পা দিয়াই শুনি, আগের দিন টাঙ্গু সহরে বোমাবর্ষণ হইয়াছে—স্টেশন ও বাজার জ্বলিয়া গিয়াছে।

মিনজান ষ্টেশনে বার্ম্মা হইতে ভারতবর্ষে যাইবার হাঁটা পথের ম্যাপ্ বিক্রয় হইতেছিল। চারি আনা মূল্যে একখানা কিনিলাম এবং ঘোড়ার গাড়ী করিয়া সেনবাবুর আত্মীয়, ডাক্তার শ্রীযুক্ত বীরেন রায়ের বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হইলাম।

আমাদের এইখানে উঠিবারই কথা ছিল ; কিন্তু বীরেন রায়ের বাসায় পৌঁছিয়া দেখি, ঘর তালাবন্ধ—তিন দিন পূর্ব্বেই তিনি সপরিবারে হাঁটাপথে রওনা হইয়া গিয়াছেন।

মুস্কিল—এখন কি করা যায়? বীরেনবাবুর রুদ্ধ ঘরের মুক্ত বারান্দায় সতরঞ্চি বিছাইয়া সকলকে বসানো হইল, পরে উহাদের চা-বিস্কু'টর ব্যবস্থা করিয়া আমি ও হরেন সেন বাহির হইয়া পড়িলাম রাস্তায়—একটা বাড়ীর খোঁজে।

● **মিনজানে অজানা বন্ধু**—একটি সতের-আঠার বছরের বাঙ্গালী ছেলের সঙ্গে দেখা হইল। আমাদের অবস্থাটা তাহাকে জানাতেই সে ভরসা দিয়া বলিল, "কোন চিন্তা নাই—আসুন। বাবার সঙ্গে দেখা করবেন—উপায় একটা হবেই। আমাদের বাড়ী এই নিকটেই।"

ছেলেটির বাবার নাম এস, সি, ঘোষ। বহুদিন যাবত মিনজানে আছেন। ছোট-বড় কয়েকটা কারবারের মালিক—খুব অমায়িক প্রকৃতির লোক। তিনি বলিলেন,—"আমার এত বড় বাড়ী থাকতে আর কোথায় উঠবেন? লোকে বল্‌বে কি?"

তিনি নিজেই উঠিয়া আমাদের সঙ্গে চলিলেন এবং গাড়ী ডাকিয়া সকলকে লইয়া নিজের বাসায় স্থানদান করিলেন। এই ভাবে অতি সহজেই আমরা তাঁহার অতিথি হইয়া পড়িলাম।

ঘোষবাবু ঠিক করিয়াছিলেন বর্ত্তমান অবস্থায় কারবার ফেলিয়া দেশে যাইবেন না। কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্প টলিল, বলিলেন, "না, আর থাকতে সাহস হয় না, আমরাও রওনা হব আপনাদের সঙ্গে। আমার সঙ্গে এখানকার ভাল-ভাল নৌকোর

মাঝি-মাল্লাদের ঘনিষ্ঠতা আছে, এখান থেকেই নৌকোয় কালেওয়া পর্য্যন্ত যাব। কিচ্ছু ভাববেন না, আমি দুদিনেই সব ঠিক ক'রে ফেলছি।"

ঘোষবাবুর গেঞ্জীর কল, মোজার কল প্রভৃতি মেশিনারী এবং আরও কিছু-কিছু জিনিষ যাহা সহজে নষ্ট হয় না, নিজের বাড়ীর উঠানে পুঁতিয়া রাখিয়াছিলেন—সেগুলি উঠাইতে লাগিলেন একটা বিলি-ব্যবস্থার জন্য; এবং এদিকে নৌকা-ওয়ালাদের খবর দিলেন।

ঘোষবাবু নৌকায় দেশের দিকে রওনা হইতেছেন কথাটা রাষ্ট্র হইতেই দলে-দলে মিনজানের বাঙ্গালী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, মাড়োয়ারী প্রভৃতি সমস্ত শ্রেণীর লোক আসিয়া ঘোষ-বাবুর কাছে ধন্না দিতে লাগিল—তাহারাও যাইবে, সকলের জন্যই নৌকার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ইহার পর সাতদিন ধরিয়া চলিল হিসাব-নিকাশ, লোক-গণনা,—কে কোন্ নৌকায় যাইবে, কি-কি সঙ্গে লওয়া দরকার, ঔষধপত্র, জলদস্যুর হাত হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য বন্দুক ও লাঠিসোটার ব্যবস্থা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

● **নৌকাযাত্রার আয়োজন**—এদেশীয় প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড দশখানা সাম্পান নৌকা ঠিক হইল। নৌকাপিছু সাড়ে তিনশ' টাকা ভাড়া, কালেওয়া পর্য্যন্ত। সুতরাং আমাদের পূর্ব্বে যে প্রোগ্রাম ছিল—মিনজান হইতে ষ্টীমারে মন্‌ওয়া হইয়া কালেওয়া

যাইব—তাহা আর বজায় রহিল না! আমরা একমাত্র নৌকা-পথেই কালেওয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। ছেলে-বুড়ো সকলে মিলিয়া আমাদের মাথা-গুন্‌তি হইল তিনশ'।

নৌকায় নম্বর দেওয়া হইল—এক হইতে দশ পর্য্যন্ত কোন্ দল কোন্ নৌকাতে যাইবে, তাহাও ঠিক করিয়া দেওয়া হইল। সমস্ত আয়োজন ঠিক—এ যেন বিজয় সিংহের সিংহল-অভিযান!

১২ই মার্চ্চ সকাল দশটায় একসঙ্গে সবগুলি নৌকা ছাড়িতে হইবে। সকলকে বলিয়া দেওয়া হইল, তাহারা যেন নম্বর অনুযায়ী জিনিষপত্র লইয়া স্ব-স্ব স্থান গ্রহণ করে।

১২ই মার্চ্চ খুব ভোরে আমরা শয্যাত্যাগ করিলাম। সহর হইতে নদীর ঘাট প্রায় মাইল দুই রাস্তা—গরুর গাড়ীতে যাইতে হইবে। সকাল-সকাল খাওয়া-দাওয়া সারিয়া লইলাম। আমরা সকলে ঘোষবাবুর পরিবারের সঙ্গে এক নৌকায় যাইব।

সকলেই প্রস্তুত—গরুর গাড়ীতেও মালপত্র উঠান হইয়াছে। ঘোষবাবু স-আম্রপল্লব একটি জলপূর্ণ ঘটের সম্মুখে গিয়া চোখ বুজিয়া বসিলেন এবং বসিলেন ত' আধঘণ্টার মধ্যে উঠিবার নামটি নাই! এমনিই আমাদের একটু দেরী হইয়া গিয়াছিল, আরও আধঘণ্টা গেল। যা হোক, অবশেষে "দুর্গা, দুর্গা," বলিয়া গরুর গাড়ীতে যাইয়া উঠিলাম।

● **যাত্রায় বাধা**—নৌকাঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখি, অবাক কাণ্ড—সমস্ত ব্যবস্থা পণ্ড! সব কয়টি নৌকাই ভর্ত্তি। আমাদের

জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল দুই নম্বর নৌকা; কিন্তু উহাতেও 'ন স্থান তিল-ধারণম্'। যত লোক হিসাব করা হইয়াছিল এবং যত লোকের কাছ হইতে ভাড়া আদায় হইয়াছিল, তাহার চাইতে অনেক বেশী লোক আসিয়া নৌকায় উঠিয়াছে—আর এই বাড়তি লোকের সবগুলিই গুজরাটী।

অদূরে নদীর পারে দেখি, বাক্স-পেটরা লইয়া একটি বাঙ্গালী পরিবার বসিয়া রহিয়াছেন। পেগুর সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার, বর্ত্তমানে পেন্সন পান; লট্‌বহরের হাঙ্গামায় তিনিও জায়গা পান নাই।

মাঝিদের মাতব্বর আসিয়া ঘোষবাবুকে বলিল, "আপনি হুকুম করেন ত' জোর ক'রে দু' নম্বর নৌকো হ'তে লোক-গুলোকে নামিয়ে দেই।"

কিন্তু ঘোষবাবু বলিলেন, "না, তা হ'তে পারে না। আমরা আর একা নৌকো দেখছি—যদি আজ না পাই, কাল যাব।"

গোলমালে তিনটা বাজিয়া গেল। একে-একে চোখের সম্মুখে দশখানা নৌকাই ছাড়িয়া দিল। কেবল ডাক্তারের পরিবার আর আমরা সেখানে পড়িয়া রহিলাম। যে ঘোষবাবু এতটা করিলেন, একখানা নৌকোও তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিল না!

সেদিন আর নৌকার যোগাড় হইল না। আমরা ক্ষুণ্নমনে আবার সহরে ফিরিয়া আসিলাম।

নৌকাযাত্রা

● **মিনজান হইতে কালেওয়া**—পরের দিন অতি কষ্টে আর-একখানা নৌকা ভাড়া করিয়া বেলা বারোটার সময় মিনজান নদীর ঘাট পরিত্যাগ করিলাম।

আমরা আশা করিয়াছিলাম, চিন্দুইন নদীতে পড়িয়া হয়ত দেখিব অন্যান্য নৌকাগুলি আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে; কিন্তু একখানা নৌকারও মাস্তুল দেখা গেল না।

মাঝিদের হিসাব মত মিনজান হইতে কালেওয়া পৌঁছিতে পনেরো দিন লাগিবার কথা। এই সুদীর্ঘ পথ একা একখানা নৌকায় চলা বড়ই বিপজ্জনক।

সেনবাবু বলিলেন, "কোন চিন্তা নাই। আমরা নিজেরাই গুণ টান্‌ব—আগের নৌকোগুলি ধরতেই হবে", বলিয়াই সকলের আগে গুণ লইয়া তিনি তীরে লাফাইয়া পড়িলেন। দেখাদেখি আমরাও পাঁচ-ছয় জন তাঁহাকে সাহায্য করিতে নামিয়া পড়িলাম।

এইবার আমাদের নৌকার আরোহীদের খানিকটা পরিচয় দেওয়া দরকার।

আমাদের নৌকায় একজন মাঝি ও চারিজন মাল্লা। সাধারণতঃ শ্রমজীবী বর্ম্মীরা যেমন কর্কশভাষী ও বদ্‌রাগী হয়, ভাগ্যক্রমে আমাদের মাঝি-মাল্লারা মোটেই সেইরূপ নয়। বৃদ্ধ

মাঝিটি আবার খুব বেশী ধর্ম্মপরায়ণ। নৌকার এক কোণে তাহার ছোট্ট একটি উপাসনা-ঘর। উহাতে আছে বুদ্ধদেবের একখানা ছবি, আর খুবই ছোট একটি প্যাগোডা।

ঘোষবাবুর পরিবারে—ঘোষবাবু, তাঁহার ছোট ভাই পরেশ-বাবু, ঘোষবাবুর ছেলে খোকন্—বয়স সতের-আঠার। এই ছেলেটির কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহা ছাড়া আরও ছিলেন ঘোষবাবুর স্ত্রী, পরেশবাবুর স্ত্রী ও তাঁহার দুই বছরের একটি ছেলে।

ডাক্তারবাবুর পরিবারে—ডাক্তারবাবু ও তাঁহার দুই স্ত্রী। দুইটিই যেন এক ছাঁচে ঢালা! বিরাট দেহ,—দেহ নয় কলেবর! —এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ! তাঁহাদের সঙ্গে আর ছিল তিনটি জোয়ান ছেলে, দুইটি অবিবাহিতা বয়স্কা মেয়ে ও চারি-পাঁচটি নাবালক। আর ইহা ছাড়া ছিল একটি হিন্দুস্থানী রাঁধুনী বামুন—নাম তার মহারাজ।

আমাদের দিকে—আমি, আমার স্ত্রী, পাঁচটি ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে, আমার শ্যালক-প্রবর শ্রীমান্ সরোজ এবং মাদ্রাজী আয়া লছমী। ইহা ছাড়া আমাদের দলে ছিলেন—সেনবাবু, পোষ্টম্যান ইন্দ্রদেও সিং এবং চারিটি ছেলেমেয়ে সহ সস্ত্রীক পোষ্টম্যান শচীন্দ্র দে। এ ছাড়া আর একটি হিন্দুস্থানী যুবক ছিল, নাম তার মাণিকরাজ সিং।

এই যুবকটি জেওয়াদ্দি সুগার-মিলে কাজ করিত। আমার সঙ্গে পূর্ব্বেই তাহার পরিচয় ছিল। ইয়েদিন ষ্টেশনে আমাকে

দেখিয়া সে আমাদের সঙ্গ লইয়াছে। খুব হাসি-খুসি, চালাক-চতুর লোক। ইতিমধ্যেই সকলেই তাহাকে ফক্কর সিং নাম দিয়া ফেলিয়াছে। যুবকটি আমার খুবই অনুগত, তাহার পরিচয়ও ইতিমধ্যেই পাইয়াছি।

খাওয়া-দাওয়া ও রান্না-বান্নার ব্যবস্থা দুই ভাগে হইল। আমাদের খাওয়া-দাওয়া হয় ঘোষবাবুর পরিবারের সঙ্গে; আর ডাক্তারবাবুরা আলাদা। প্রকাণ্ড নৌকা, বিশেষ কোন অসুবিধা হইল না!

জলদস্যুর হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য আমরা একপ্রকার প্রস্তুত হইয়াই রওনা হইয়াছিলাম। আমাদের সঙ্গে ছিল গোটাবারো সুপক্ক বাঁশের লাঠি, কয়েকটা বল্লম এবং কাঠের তৈরী কালো রং-করা একটা নকল বন্দুক।

কথা হইল, ঘোষবাবু দিনের বেলা এই নকল বন্দুক লইয়া ছইয়ের উপর গিয়া বসিয়া থাকিবেন; উদ্দেশ্য—নদীর পারের লোকগুলিকে ভয় দেখান এবং মৌন ভাষায় যেন এই ইঙ্গিত করা যে, 'বাপুরা, এদিকে নজর দিও না। এদিকে ঘেঁষলে বড় সুবিধা হবে না—হাতে আমাদের বন্দুক আছে।'

হরেন সেন হইলেন আমাদের আত্মরক্ষা-পার্টির কমাণ্ডার। তাঁহার নির্দ্দেশমত রাত্রিতে নৌকা-পাহারা দিবার জন্য আমরা দুই দলে বিভক্ত হইলাম। ঠিক হইল, প্রথম দল সজাগ থাকিবে রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত, আর দ্বিতীয় দল রাত্রি বারোটা হইতে ভোর পর্য্যন্ত। সঙ্গে তাস ছিল, কাজেই ব্রীজ খেলিয়াই যে

ডিউটি দেওয়া যাইবে, সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলাম। ডাক্তারবাবুর একটা ভাল বড় গ্রামোফোন ছিল কিন্তু উহাতে রেকর্ড বাজাইতে গেলে হয়ত দুই পারের লোক ভাঙিয়া পড়িবে, কাজেই এই আনন্দটুকু হইতে আমাদের বঞ্চিত হইতে হইল!

একটা রাত্রি পার হইতেই কিন্তু আমরা হাড়ে-হাড়ে বুঝিলাম যে, ডিউটি থাকুক, আর নাই থাকুক, অনিদ্র আমাদের থাকিতে হইবে সকলকেই। এই জন্য না দরকার হইবে গ্রামোফোনের, না প্রয়োজন হইবে তাসের! ডাক্তারবাবুর দুই গিন্নীই আমাদিগকে সজাগ রাখিবে সারারাত্রি।

শায়িত ব্যক্তির কানের কাছে যদি একটা ষ্টীম-ইঞ্জিন চলিতে থাকে, তবু হয়ত তাহার ঘুম হইতে পারে; কারণ ইঞ্জিনের একটানা শব্দে একটা অর্থহীন সুর আছে, যাহা নাকি অধিকক্ষণ চিত্তকে বিক্ষিপ্ত রাখিতে পারে না; কিন্তু ডাক্তারবাবুর দুই সপত্নীর মধ্যে সারারাত্রি ধরিয়া যে ভীষণ কোন্দল ও বাক্যবাণ বিনিময় চলে তাহা এমনই মারাত্মক যে, নিদ্রাদেবী আর কাহারও ত্রিসীমানায়ও আসিতে পারিবেন না, সে সম্বন্ধে আর কোন দ্বিধা রহিল না।

ডাক্তারবাবু নিরীহ প্রকৃতির লোক। কেন যে তিনি এই আপদ জুটাইলেন, লজ্জা-সরমের মাথা খাইয়া সরাসরি একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলাম! ডাক্তারবাবু যাহা বলিলেন, মোটামুটি ভাবে তাহা এই দাঁড়ায়ঃ—

চাকরী হইতে ছুটিতে দেশে দিয়া তিনি প্রথম বিবাহ করেন

এবং সস্ত্রীক বার্ম্মা রওনা হইতে চাহেন। কিন্তু কি জানি কেন, স্ত্রী তখন মগের মুল্লুকে আসিতে কিছুতেই রাজী হইলেন না। ডাক্তারবাবু একাকীই বার্ম্মাতে রওনা হইয়া আসিলেন; কিন্তু তাঁহার এই নিঃসঙ্গ জীবন বেশীদিন ভাল লাগিল না। আবার তিনি ছুটি লইয়া দেশে আসিলেন এবং স্ত্রীকে অনেক সাধ্য-সাধনা করিলেন তাঁহার সহগামিনী হইতে; কিন্তু স্ত্রী অটল অচল। অগত্যা ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে আর-একদিন সানাই বাজিয়া উঠিল,—অর্থাৎ ডাক্তারবাবু দ্বিতীয় পক্ষ করিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহাকে লইয়া বার্ম্মা রওনা হইলেন।

এত সব কাণ্ড-কারখানার সময় প্রথম পক্ষ বাড়ী ছিলেন না। ডাক্তারবাবু টিকেট কিনিয়া আউটরাম-ঘাটে জাহাজে উঠিতে যাইবেন, সহসা দেখেন প্রথম পক্ষও হাজির! তারপর আর কি? সেই হইতেই এই দুই সতীন সেই যে ডাক্তারের দুই কাঁধে চাপিয়াছেন, তাহা আর ঝাড়িয়া ফেলিবার উপায় নাই।

দুই দিন ক্রমাগত চলিবার পর আমাদের আগে-পিছে আরও চারিখানা যাত্রীপূর্ণ নৌকা নজরে পড়িল। সেই দিন হইতে প্রতি সন্ধ্যায় পাঁচখানা নৌকাই একস্থানে নোঙ্গর করা ঠিক করিলাম। ভয়টা একটু কমিল।

● **মনওয়া**—ছয় দিনের দিন নৌকাগুলি মনওয়া পৌঁছিল। এই স্থান হইতে ষ্টীম-লঞ্চে কালেওয়া যাওয়া যায়—মাত্র দুই দিন লাগে।

দেখিলাম—নদীর তীরে-তীরে দেড় মাইল, দুই মাইল স্থান জুড়িয়া হাজার-হাজার 'ইভাকুইজ' (Evacuees, অর্থাৎ বার্ম্মাত্যাগী) ষ্টীমারের আশায় পোঁট্‌লা-পুঁট্‌লি সহ বসিয়া আছে। কিন্তু প্রতিদিন মাত্র একখানা করিয়া ষ্টীমার ছাড়ে। ছোট ষ্টীমার, অতি কষ্টে তাহাতে মাত্র শ'-তিনেক যাত্রীর স্থান হইতে পারে; কাজেই টিকেটের জন্য অমানুষিক প্রতিযোগিতা!

দরিদ্র ও অসহায় যাত্রীর দল ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। এদিকে রোগের প্রকোপের হাত হইতে সহরকে রক্ষা করিবার জন্য সহরের কর্ত্তৃপক্ষ আদেশ দিয়াছেন, নদীর পার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে এবং সহরে কেহ প্রবেশ করিতে পারিবে না। বেচারাদের দুর্দ্দশার সীমা নাই!

এখান হইতেও কালেওয়াগামী নৌকা ভাড়া পাওয়া যায়; কিন্তু এক-একখানা নৌকা-ভাড়া তখন পাঁচশ' টাকায় গিয়া ঠেকিয়াছে! কপর্দ্দকশূন্য ইভাকুইজদের পক্ষে নৌকায় যাওয়াও অসম্ভব।

শুনিলাম, পেগু-ডিভিশনের পোষ্টাল সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট্‌ মনওয়া সহরে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। ইদাসীর পোষ্ট-মাষ্টারের কথা মনে পড়িল। ভদ্রলোক খবরও পান নাই—এখনও হয়ত তিনি পেগু হইতে আদেশ পাইবেন বলিয়া অপেক্ষা করিতেছেন! অথবা ইতিমধ্যে অফিস প্রভৃতি লুটপাট হইয়া গিয়াছে কিনা, তাই বা কে জানে?

মনওয়ার পরে—মনওয়া হইতে নৌকা ছাড়িতেই দুই-একটি করিয়া মড়া ভাসিয়া আসিতে দেখা গেল। কলেরার মড়া। মনওয়া সহরেও নাকি বহু আশ্রয়প্রার্থী কলেরায় মারা গিয়াছে। আমাদের নৌকার সকলেই কলেরার টিকা লইয়াছিলাম কিন্তু তবুও খাওয়া-দাওয়া ব্যাপারে সাবধান হইতে হইল। নদীর জল ফুটাইয়া পান করিবার ব্যবস্থা হইল।

যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, মড়ার সংখ্যা ততই বাড়িতে লাগিল। নদীর পারে বালুচরেও কয়েকটা মৃতদেহ দেখা গেল; কোনটা অর্দ্ধপ্রোথিত, কোনটা বা মস্তক অথবা হস্তপদহীন—শেয়াল-কুকুরে টানা-হেঁচড়া করিয়াছে। সে এক বীভৎস দৃশ্য! আমাদের মুখ-চোখ শুকাইয়া উঠিল।

চিন্দুইন নদী। নদীর জল কাক-চক্ষুর মত স্বচ্ছ, সুস্বাদু আর বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা; কিন্তু এহেন জলও কলেরার ভয়ে না ফুটাইয়া পান করিবার উপায় নাই। দুই তীরের দৃশ্য অতি সুন্দর। এক তীরে নিবিড় অরণ্য, আর এক তীরে অভ্রভেদী পাহাড়শ্রেণী। কোন-কোন স্থানে পর্ব্বতের সুউচ্চ চূড়া ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে নদীর দিকে ছাতার মত, যেন নদীর নীল জলে সঞ্চরমান মৎস্যগুলিকে উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া দেখিতে চায়!

পর্ব্বতের পাদদেশগুলি তরঙ্গাঘাতে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া স্থানে-স্থানে গুহার সৃষ্টি করিয়াছে। দুই-একটি গুহা এত বড় যে, কোথায় যে তাহার শেষ সীমা, তাহা বুঝিবার যো নাই।

পাহাড়ের শীর্ষদেশে কোন-কোন স্থানে কে বা কাহারা নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে সুন্দর ছোট্ট-ছোট্ট প্যাগোডা !

সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য আরও মনোরম। নির্জ্জন স্থানের নীল আকাশের গায়ে প্যাগোডার স্বর্ণচূড়া সূর্য্যালোকে ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে। মৃদুমন্দ পবন-হিল্লোলে চূড়ার ঘণ্টাগুলি বাজিতেছে —টিং টিং টিং ! তথাগতের প্রতি সুন্দর শ্রদ্ধা নিবেদন !

আমাদের ঠিক পেছনেই একখানি যাত্রীবাহী নৌকা আসিতেছিল। লোকগুলি মাদ্রাজ-অঞ্চলের তেলেগু শ্রমজীবী—'কুরঙ্গী কুলী' নামে পরিচিত। মাথাপিছু ভাড়া কম পড়িবে বলিয়া উহারা এত লোক উঠিয়াছিল যে, নৌকাতে আর তিল ধারণেরও স্থান ছিল না। একে অপরের গায়ে শক্ত করিয়া লাগিয়া বসিয়া আছে—নড়াচড়া করিবার ফাঁকটুকু পর্য্যন্ত নাই। শুনিলাম ইহার মধ্যেই একজনের নাকি কলেরা হইয়াছে। বেচারাদের নিজেদের ত' শুইবার জায়গা নাইই, এই রোগীটিকে যে একটু আরামে রাখিবে, এমন স্থানও নৌকায় নাই।

আমাদের নৌকায় ডাক্তারবাবুর নিকট এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক দুই রকম ঔষধই ছিল। রোগীকে যথারীতি ঔষধ সেবন করানো হইল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, হতভাগার জীবন শেষ হইয়া গেল।

মৃতদেহটা আমরা উহাদিগকে বালুচরে পুঁতিয়া রাখিতে বলিলাম। কারণ, জলে ফেলিলে জল বিষাক্ত হইবে। কিন্তু উহারা সকাতরে আমাদের জানাইল যে, তাহা হইলে লোকটির

আত্মার সদ্‌গতি হইবে না—গঙ্গামাঈর কোলেই উহাকে দিতে হইবে।

নদী মানেই উহাদের গঙ্গা। হিন্দু হইয়া ইহাতে আর আপত্তি করা চলে কি করিয়া?

লোকটির শবদেহটা ভাসিয়া চলিল; যতদূর দেখা যায়, একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। লোকটি জাপানী বা বর্ম্মীদের হাত হইতে প্রাণ বাঁচাইয়া চলিয়া আসিয়াছিল। কবে কোন্ পুরুষে যে উহার দেশের সঙ্গে সকল সম্পর্ক চুকিয়া গিয়াছে, হয়ত ও নিজেই জানে না। দেশে হয়ত কোনও আত্মীয়-স্বজন আছে বা নাই, তবু প্রাণের দায়ে সে ভুলে-যাওয়া দেশকেই এখন ওর সর্ব্বাপেক্ষা আপনার বলে মনে হইয়াছিল—মাথা গুঁজিবার একটু ঠাঁই ত' মিলিবে! তাহার আশা ছিল, নূতন উৎসাহে নূতন উদ্যমে আবার সে ঘর বাঁধিবে; কিন্তু অর্দ্ধপথেই যম তাহাকে টানিয়া লইল! এক ফোঁটা চোখের জলও তাহার জন্য কেহ ফেলিল না। আজ সন্ধ্যায়ই আবার উহার নৌকায় হয়ত মাদল বাজিয়া উঠিবে, উহার সঙ্গীরা হল্লা করিয়া গান ধরিবে, এই হতভাগার কথা হয়ত একবারও তাহাদের মনে পড়িবে না!

● **অতি-সতর্ক পুলিস**—একটা বড় গ্রামের কাছ দিয়া চলিলাম। জায়গাটার নাম কা-নি। এখানে নাকি বাজার, পুলিশ-ষ্টেশন এবং ডাক ও তার-অফিস আছে। ঠিক করিলাম, এখানে আর নৌকা ভিড়াইব না। কিন্তু লোকে ভাবে এক,

হয় আর। আমরা চলিয়া যাই দেখিয়া, পুলিশের লোক আমাদিগকে তীরে নৌকা ভিড়াইতে হুকুম করিল। অগত্যা ভিড়াইতে হইল।

ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিতেই একজন পাঞ্জাবী পুলিশ আগাইয়া আসিয়া বলিল যে, এইখানে আমাদের কিছুক্ষণ আটক থাকিতে হইবে, অন্য আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত। কারণ, উপরওয়ালার হুকুম।

আমরা নির্ব্বিবাদে মনওয়া ডিষ্ট্রিক্ট-টাউন পার হইয়া আসিলাম। এইরূপ কোন আদেশ থাকিলে সেইখানেই জানিতে পারিতাম। এই নগণ্য স্থানে নৌকা আটক রাখিবার কি কারণ থাকিতে পারে? দেখি, আরও পাঁচ-ছয়খানা নৌকাও আটক পড়িয়াছে এবং যাত্রীদের সঙ্গে ঐ পাঞ্জাবী ও একটি বর্ম্মী পুলিশের ফিস্‌ফিস্ করিয়া কানাঘুষা চলিতেছে।

একজন যাত্রী আমাদের জানাইল, "মহাশয়, হুকুম-আটক কিছুই নয়, ওরা কিছু চায়—নৌকা পিছু দশ টাকা।"

আমাদেরও এই সন্দেহই হইয়াছিল। কাজেই পুলিশকে গিয়া বলিলাম, আমরা এখনই মনওয়া ডিষ্ট্রীক্ট-ম্যাজিষ্ট্রেটকে টেলিগ্রাম করিতেছি, হুকুমটা কি সঠিক জানিতে হইবে; কারণ আমাদের আর দেরী করা চলে না।

পাঞ্জাবী পুলিশটা তখন ক্যাব্‌লাকান্ত-হাসি হাসিয়া বলিল—"আপনারা শিক্ষিত লোক আছেন—হুকুম নিশ্চয়ই পাবেন। কাজেই আপনাদের আর আট্‌কাতে চাইনে, নৌকা ছাড়ুন।"

বলিলাম, "বাপু, তুমিও ভারতীয়, দেশের লোক; তোমাকেও শীগ্‌গির পালাতে হবে। নইলে তুমিও রেহাই পাবে না। কয়েকটা টাকার জন্যে মিছামিছি লোকগুলোকে হয়রান করো না। যে বর্ম্মী পুলিশটাকে তোমার মাসতুত ভাই ব'লে ধ'রে নিয়েছ—সেই হয়ত একদিন তোমার গলায় ছুরি বসাবে।"

নৌকা ছাড়িয়া মাইল দুই যাইতেই সন্ধ্যা হইল। আজ আমরা একা। অন্য নৌকাগুলি হয়ত কা-নিতেই পুলিশের সঙ্গে দর-কষাকষি করিতেছে। আজ আবার আমাদিগকে একটু সতর্ক থাকিতে হইবে। নদীর মাঝপথে নৌকা নোঙ্গর করিলাম।

● **নিশীথের আগন্তুক**—ভীষণ অন্ধকার রাত্রি। কোনদিক হইতে কোন আলোই দেখা যাইতেছে না! আশেপাশে দুই মাইলের মধ্যেও হয়ত কোন গ্রাম নাই, একটা বিরাট থম্‌থমে নিস্তব্ধতা!

রাত্রি বারোটা বাজিল। এতক্ষণ আমরা চারিজন পাহারায় ছিলাম। এইবার ব্রীজ খেলা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলাম—অন্য দলকে জাগাইয়া দিতে হইবে। হঠাৎ আমাদের নৌকার খুব কাছেই ছপ্‌ছপ্‌ জলের শব্দ শুনা গেল।

আমি শব্দ লক্ষ্য করিয়া টর্চ্চের আলো ফেলিলাম। সেই সুতীব্র আলোকে দেখা গেল, একখানা সাম্পান (ক্ষুদ্র ডিঙ্গি

নৌকা) আমাদের নৌকার ঠিক গায়ে আসিয়া লাগিয়াছে। সাম্পানে তিনজন বর্ম্মী—হাতে এই দেশীয় লম্বা দা।

সেনবাবু একটা বর্শা তুলিয়া লইয়া গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাও তোমরা ? এতরাত্রে নৌকার কাছে কেন ?"

আমরা যে জাগিয়া আছি, লোকগুলি বোধ হয় তাহা আশা করে নাই, থতমত খাইয়া জবাব দিল, "একটু আগুন চাই বাবু, চুরুট ধরাব।"

সেনবাবু এইবার দস্তুর মত রাগিয়া গেলেন, কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন, "এত রাত্রে চুরুট ধরাতে এসেছ এখানে ? চালাকীর আর জায়গা পাওনি বুঝি ! ভাল চাওত স'রে পড়।"

এইবার আর একটা লোক আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া খুব বিনীতভাবে বলিল, "আগুন-টাগুন কিছু নয় বাবু, বড় অভাবে আছি। তোমরা দেশে যাচ্ছ, সকলের কাছেই পয়সাকড়ি আছে। গোটা-পাঁচেক টাকা দাও, খুসী হয়ে চলে যাই।"

আমি ইত্যবসরে নকল বন্দুকটা লইয়া আসিয়া হাজির হইয়াছি। অন্যান্য সকলেও জাগিয়া উঠিয়াছে, সকলের হাতেই লাঠিসোটা। বন্দুকটা দেখাইয়া আমি বলিলাম, "আর দ্বিতীয় কথা বলবে ত' গুলি করব। প্রাণের মায়া যদি থাকে, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।"

—"ঠাট্টা করছিলাম বাবু, সেলাম !" বলিয়া অতি দ্রুত সাম্পান আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া অন্ধকারে মিশিয়া গেল। সে রাত্রে আর কাহারও ঘুম হইল না।

● **কালেওয়া**—ইহার দুই দিন পরেই আমাদের নৌকা কালেওয়া পৌঁছিল। এইখান হইতেই আমাদের হাঁটাপথ সুরু।

নদীর এক পারে কালেওয়া সহর, অন্যপারে এক এক মাইলব্যাপী স্থান জুড়িয়া ইভাকুইজদের জন্য অসংখ্য তাঁবু খাটান হইয়াছে। এই পারেই আমাদিগকে নৌকা ভিড়াইতে দেওয়া হইল। আমরা যখন এখানে পৌঁছি তখন সন্ধ্যা। ঠিক করিলাম, রাত্রিটা নৌকাতেই কাটাইব—পরের দিন যা হয় করা যাইবে।

এইখানেও কলেরার প্রকোপ, তবে রোগীদের জন্য আলাদা ক্যাম্প আছে। খবর লইয়া জানিলাম, এখান হইতে পার্ব্বত্য খাল দিয়া নৌকাতে আঠার মাইল পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়া যায়। প্রতি নৌকার ভাড়া পঁচিশ টাকা, সরকারই রেট্ বাঁধিয়া দিয়াছেন এবং নৌকার বিলি-ব্যবস্থাও গভর্ণমেণ্টের হাতে।

যাহারা নৌকা চায়, এইখানে পৌঁছিয়াই তাহাদের নাম রেজেষ্টারী করিতে হয়। কিন্তু জানিলাম, যাঁহারা ছয়-সাত দিন পূর্ব্বে নাম রেজেষ্টারী করিয়াছেন, তাঁহারাও এ পর্য্যন্ত নৌকা পান নাই! এখানেও টাকার খেলা চলিতেছে অর্থাৎ পঁচিশের স্থানে পঞ্চাশ দিলে একদিনেই নৌকা মিলে।

আঠার মাইল পরে নাকি সরকার হইতেই যাত্রীদের জন্য গরুর গাড়ীর ব্যবস্থা হইয়াছে; কিন্তু বুঝিতে আর বাকী রহিল না, সেইখানেও এই টাকার খেলা।

আমাদের সঙ্গে ছোট-ছোট শিশু; কিছু অর্থদণ্ড হইলেও নৌকার জন্য আমাদের অপেক্ষা করিতেই হইবে। তাছাড়া আর উপায় নাই।

●পায়ে চলার ব্যবস্থা—পরের দিন ভোরে সেনবাবুদ্বয় দেখিতে বাহির হইলেন কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরেই দশজন উড়িয়া কুলী লইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "আমরা আর নৌকার জন্য অপেক্ষা করতে চাই না, আমাদের জিনিষপত্র আর আপনার ছেলেমেয়ে এই কুলীরাই বয়ে নেবে। গরুর গাড়ী না পাওয়া পর্য্যন্ত বৌদিকে (আমার স্ত্রী) একটু কষ্ট ক'রে হাঁটতেই হবে। আর তা' না ক'রে এখানেই যদি ছ'সাত দিন অপেক্ষা করি, তাহ'লে জাপানী বোমায়ই প্রাণটা যাবে।"

আমাদের ত' একটা ব্যবস্থা হইল, কিন্তু ঘোষবাবু আর ডাক্তারবাবুর পরিবারকে ফেলিয়া যাই কি করিয়া?

সেনবাবু বলিলেন, "অন্য কুলী আর পাওয়া যাবে না। এই কুলীর দল টাঙ্গুতে আমাদের অধীনেই কাজ করত। এদের দলে অবশ্য সবশুদ্ধ পঞ্চাশজন লোক আছে; কিন্তু সকলেরই পোঁটলা-পুঁটলি আছে। পয়সার লোভ দেখিয়ে এখন এদের রাজী করানো কঠিন। কেবল আমার খাতিরেই অতি কষ্টে এই দশজনকে পাওয়া গেছে। অন্য কুলীরা সহরেই এক গাছতলায় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। এখনই আমাদের

রওনা হ'তে হবে—আর এক মুহূর্ত্তও এখানে দেরী করলে চলবে না।"

মিলিটারী হুকুম—এবং হুকুমের সঙ্গে-সঙ্গেই হরেন সেন আমাদের জিনিষপত্র গুছাইতে লাগিয়া গেলেন।

কুলী যখন আর পাওয়া গেল না, তখন ঘোষবাবু ও ডাক্তারবাবু বলিলেন, নৌকার জন্যই তাঁহারা অপেক্ষা করিবেন। তাঁহাদের সঙ্গে যে জিনিষপত্র আছে, এই আঠার মাইল পর্য্যন্ত তা' বহন করাও কষ্টকর।

সুতরাং এইখানেই তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের ছাড়াছাড়ি হইল।

বিদায় লইতে ও বিদায় দিতে গিয়া মনটা খারাপ হইয়া গেল। ঘোষবাবু মিন্‌জানে আমাদের আশ্রয় দিয়াছিলেন—নৌকাপথেও একসঙ্গে তের দিন কাটিয়াছে। এক পরিবারের মতই ছিলাম। পাশাপাশি শুইয়া, এক কম্বল দুইজনে গায়ে দিয়াছি; কত সুখ-দুঃখ আশা-আশঙ্কার কথা কহিয়া রাত কাটাইয়াছি! আর দেখা হয় কি না, তাই বা কে জানে?

তবু যাইতে হইবে। এক-একজনের এক-এক রকম অসুবিধা। একসঙ্গে সকলের ব্যবস্থা করিতে গেলে শেষ পর্য্যন্ত হয়ত কাহারও কোন ব্যবস্থাই হইবে না—অনর্থক পেছনে পড়িয়া থাকিতে হইবে।

অগত্যা ঘোষবাবুর ও ডাক্তারবাবুর দেশের ঠিকানা টুকিয়া

লইলাম—যদি দেশে পৌঁছিতে পারি, হয়ত একদিন আবার দেখা হইবে।

আমার স্ত্রী চোখের জল মুছিয়া খুব আঁটসাট্ করিয়া শাড়িটা পরিয়া, কোমরে ভাল করিয়া আঁচলটা জড়াইয়া লইল। তারপর ভোর ঠিক আটটার সময় "শ্রীদুর্গা" বলিয়া আমরা হাঁটাপথে অজানার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলাম।

হাঁটাপথে

(কালেওয়া হইতে তৃতীয় ক্যাম্প : ৩২ মাইল)

যাত্রা সুরু—কালেওয়া সহরে প্রবেশ করিয়াই কানে তালা লাগিয়া গেল ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ডাকে! এমন বিকট ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ডাক আর কেহ কোথাও শুনিয়াছে কি না সন্দেহ।

ছোট সহর—বাড়ীগুলি ছোট-ছোট টিলার উপর। সহরের মধ্যেই ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত নানান রকম গাছপালা—দেখিতে মন্দ লাগে না।

রাস্তার দুই পাশে, সেই সকালেই দেখি,—অসংখ্য দোকান বসিয়াছে। বিক্রেতারা বেশীর ভাগই বার্ম্মাত্যাগীর দল। ষ্টীল-ট্রাঙ্ক, সুটকেস, দেয়াল-ঘড়ি, হারমোনিয়াম এবং গ্রামাফোন ইত্যাদি দুই-তিন টাকা করিয়া জলের দরে বিক্রয় হইতেছে।

নৌকাপথে যে যা পারে সঙ্গে আনিয়াছিল, কিন্তু আর লইয়া যাইবার উপায় নাই। সম্মুখে প্রসারিত বিশ্রী দীর্ঘ পথ—সে পথ চলিয়া গিয়াছে শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যের মধ্য দিয়া, দুর্দ্দান্ত-প্রকৃতি লোকের বসতির পাশ দিয়া এবং প্রখর রৌদ্রতপ্ত পাহাড়ের উপর দিয়া।

যে ছোট-ছোট শিশুগুলিকে একদিন কোলে-পিঠে করিয়া

লোকে স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিত, সেই সুকোমল শিশুগুলিই আজ একমাত্র বোঝা হইয়া দাঁড়াইয়াছে! ইচ্ছা করিয়াই হউক বা অনিচ্ছাতেই হউক, অন্য বোঝা আজ ঝাড়িয়া ফেলিতেই হইবে। সম্মুখের গেরুয়া রঙের পথটা আজ সাপের মত দুই চোখ মেলিয়া আকর্ষণ করিতেছে—স্থির থাকিবার উপায় নাই। কে আসিতে পারিল না, কে পিছে পড়িয়া রহিল,—ঘাড় ফিরাইয়া সেদিক পানে তাকাইবারও অবসর নাই।

● **প্রথম ক্যাম্প**—বেলা সাড়ে বারোটার সময় নয় মাইল পার হইয়া প্রথম ক্যাম্পে উপস্থিত হইলাম। সমগ্র হাঁটাপথেই নয় মাইল, দশ মাইল অথবা বারো মাইল অন্তর-অন্তর—অর্থাৎ যেখানে জল পাওয়া যায় এমন স্থানে—গভর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক ইভাকুইজদের জন্য ক্যাম্প বসান হইয়াছে।

নমুনা হিসাবে প্রথম ক্যাম্পটা পরখ করা গেল। অসমতল বাঁশের মাচার উপর খড়ের ছাউনি—লম্বা ব্যারাকের মত চারিখানা ঘর। পেছন দিকে চাটাইয়ের বেড়া, সম্মুখভাগ অনাবৃত। ভাগ্যক্রমে স্থান দখল করিতে পারিলে, কম্বল পাতিয়া একটা গণ্ডী টানিয়া রাতটুকু কাটাইবার ব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু আমরা যখন পৌঁছিলাম তখন লোক গিজ্‌গিজ্‌ করিতেছে। আশেপাশের গাছপালাগুলিও খালি নাই। ক্ষুধা-নিবৃত্তির আয়োজনে সহস্র চুল্লী জ্বলিয়া উঠিয়াছে—কলিকাতার নিমতলা-শ্মশানের দৃশ্য!

জায়গাটা স্যাঁৎসেঁতে, তার উপর মাছি ভন্‌ভন্‌ করিতেছে। এক মুহূর্ত্ত আর এখানে তিষ্ঠিতে ইচ্ছা হইল না। শুনিলাম, মাইলখানেক আগে নদীর ধারে একটা ফুঙ্গীচঙ্‌ (বৌদ্ধ মন্দির) আছে—আম আর আমলকী-বাগানের মধ্যে।

স্ত্রীকে ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, আর একটু হাঁটিতে পারিবে কি না। স্ত্রী সহাস্যমুখে মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

আশ্চর্য্য হইলাম! এতটা আশা করিতে পারি নাই। যে জীবনে অর্দ্ধমাইলও কোনদিন হাঁটিয়া দেখে নাই, সে আজ অম্লানবদনে এতটা পথ হাঁটিয়া আসিয়াছে!

ক্যাম্প হইতে ইভাকুইজদের চাউল-ডাইল বিতরণ করা হয়; কিন্তু আমাদের কিছু লইবার প্রয়োজন হইল না—তিন দিনের উপযুক্ত আহার্য্য আমাদের সঙ্গেই ছিল। লুচি-তরকারী তৈয়ার করিয়া আনা হইয়াছিল এবং পথিমধ্যেই একস্থানে বসিয়া পেট পূরিয়া খাওয়া হইয়াছিল। কাজেই ফুঙ্গীচঙের উদ্দেশ্যেই আবার চলিতে সুরু করিলাম।

চঙে পৌঁছিয়া দেখিলাম, স্থানটা বাস্তবিকই ভাল। মস্ত-বড় বাগানের মধ্যে একটা বুদ্ধদেবের মন্দির। মন্দির ঘেরিয়া চারি-পাঁচখানা ঘর—নিকটে কোন লোকালয় নাই। কতকগুলি ইভাকুইজ পূর্ব্বাহ্লেই দুইখানা ঘর দখল করিয়া বসিয়াছে—আমরা যে ঘরখানা পাইলাম, তাহাও খারাপ নয়। সিমেণ্টের মেজে—টিনের ছাউনি—চারিদিক খোলা একটা আটচালার মত।

কাছেই নদী—সুন্দর টলটলে জল। হাতমুখ ধুইয়া পা

ছড়াইয়া বসিলাম। আমাদের সহযাত্রী উড়িয়া কুলীর দল গাছ-তলাতেই পোঁট্লা-পুট্লি নামাইয়া জায়গা করিয়া লইল। ইন্দ্রদেও, মাণিকরাজ আর শচীন্দ্র কাজে লাগিয়া গেল। দুইজন গেল জঙ্গলে কাঠ কুড়াইতে, আর একজন মাটি খুড়িয়া ইট পাতিয়া চুলা করিয়া ফেলিল!

মেয়েদের ভাগ্যে বিশ্রাম-সুখ নাই—এখনই তাহাদের রান্নার যোগাড় করিতে হইবে—এক-এক কাপ চা'র জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছে।

পরের দিন রাত থাকিতেই রওনা হইতে হইবে। রৌদ্রের তেজ বাড়িতে থাকিলে রাস্তা তাতিয়া আগুন হইয়া উঠে। সন্ধ্যা হইতেই খাইয়া-দাইয়া শুইয়া পড়িলাম।

● **অনাহুত অতিথি**—দশ মাইল হাঁটিয়াই যথেষ্ট ক্লান্ত হইয়াছিলাম, অল্পক্ষণেই চোখের পাতা বুজিয়া আসিল। হঠাৎ ঘরের এক কোণ হইতে একটা কোলাহল উঠিল। উঠিয়া দেখি, মাণিকরাজ একটা মাদ্রাজীর টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া ঝাঁকানি দিতেছে—বিড়ালে যেন ইঁদুর ধরিয়াছে!

মাদ্রাজীটার পরণে ফুলপ্যাণ্ট—গায়ে ছেঁড়া হাফশার্ট। বিরাট দেহ কিন্তু পাগলের মত টলিতেছে আর ইংরাজীতে বিড়্-বিড়্ করিয়া কি যেন বলিতেছে!

আমি উঠিয়া যাইয়া উহাদিগকে ছাড়াইয়া দিলাম এবং জানিতে চাহিলাম ব্যাপার কি?

ব্যাপার আর কিছুই নয়—লোকটা নাকি আমাদের ঘরের চতুর্দ্দিকে সন্দিগ্ধভাবে ঘোরাঘুরি করিতেছিল।

হয়ত বেচারার মাথা খারাপ। বিশেষতঃ ওর বিরুদ্ধে যখন কোন খারাপ মতলবের প্রমাণ পাওয়া গেল না, তখন আর কি করা যায়? টলিতে টলিতেই লোকটা একদিকে চলিয়া গেল—আর যে এদিকে ঘেঁষিবে না, সে সম্বন্ধেও আমাদের সন্দেহ রহিল না।

●আবার পথচারী—রাত্রি তিনটা বাজিতেই তাড়াহুড়া পড়িয়া গেল। পরোটা ভাজিয়া টিফিন-কেরিয়ার ভর্ত্তি করা হইল—তিনটা বড় বড় ফ্লাস্কে জল গরম করিয়া ঢালা হইল। পথে জলের অভাব। এখান হইতেই নদী দূরে সরিয়া গিয়াছে আর নদীর জল পান করাও এখন নিরাপদ নয়। দুই-একটি করিয়া এখনও কলেরায় মরিতেছে—যাত্রীদের মধ্যে কাহারও কাহারও নাকি বসন্তও হইয়াছে।

ঠিক চারিটা বাজিতেই রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। তখনও বেশ অন্ধকার আছে। আমাদের আগে-পিছে বহু যাত্রী চলিতেছে—অন্ধকারে কাহারও মুখ দেখা যায় না। কাহারও মুখে টুঁ শব্দটি নাই। বোঁচ্‌কা-বুঁচ্‌কি ঘাড়ে সেই অস্পষ্ট চলমান জনস্রোতকে মনে হইতেছে এক অশরীরী নিশাচর-বাহিনী!

রাস্তার এক কিনারায় দাঁড়াইয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলাম। পথের দুই পার্শ্বস্থিত সুউচ্চ

সেগুন বৃক্ষশ্রেণীকে মনে হইতেছে দুর্ভেদ্য প্রাচীর। সেই প্রাচীরের ফাঁকে একফালি আকাশ চলিয়াছে আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে।

আকাশের বুক হইতে একটি দুইটি করিয়া তারকাগুলি নিভিয়া গেল। অগ্রে-পশ্চাতে দক্ষিণে-বামে হাজার হাজার পাখী কলকণ্ঠে ঐক্যতানে যোগ দিল। নিবিড় অরণ্য ভেদ করিয়া প্রভাত-অরুণের সোনালী রশ্মি পত্রান্তরালে ঝিক্‌মিক্‌ করিয়া উঠিল। সে এক অপূর্ব্ব অনুভূতি! অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তিগুলি এইবার রক্ত-মাংসের দেহ লইয়া স্পষ্ট হইয়া দেখা দিল।

এক মাদ্রাজী বৃদ্ধা আমাদের বিপরীত দিক হইতে লাঠিভর করিয়া ঠুক্‌ঠুক্‌ করিয়া আসিতেছে। যাহাকে দেখে, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করে, "আমার ছেলেকে দেখেছ? লম্বা জোয়ান চেহারা? হায়, হায়, ছোকরার মাথার ঠিক নাই—এখন সামলাই কি ক'রে?"

গতকল্যকার রাত্রির ঘটনার কথা মনে পড়িল। নিশ্চয়ই ঐ মাদ্রাজীটাই এই বৃদ্ধার ছেলে। বৃদ্ধা যে চেহারার বর্ণনা দিল, হুবহু মিলিয়া গেল।

তাহাকে জানাইলাম যে, তাহার ছেলে কাল রাত্রিতে ফুঙ্গীচঙে আমাদের ওখানেই ছিল; হয়ত একটু পরেই সে আসিতেছে।

কিন্তু ব্যাপার কি? বৃদ্ধা বুক চাপড়াইতে-চাপড়াইতে বলিল, তাহার ছেলে গভর্ণমেণ্টের নোক্‌রি করে—তাহারা

থাকিত বার্ম্মার সব চাইতে সেরা সহর মেমিওতে। মনওয়া পৌঁছিয়া বৃদ্ধার তিনটি নাতিই কলেরায় মারা গিয়াছে। বৃদ্ধার পুত্রবধূও সঙ্গেই ছিল, পাগলের মত হইয়া সে একদিকে কোথায় চলিয়া গিয়াছে! এখন ছেলের মাথাও ঠিক নাই। যেখানে কোন পরিবার দেখিবে, সেখানে গিয়াই ছেলে হাজির হইবে আর কেবল বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া বকিবে।

ছেলের খোঁজে বৃদ্ধা চলিয়া গেল। ছেলে বোধহয় খুঁজিয়া বেড়ায় নিজের স্ত্রীকে আর তিন-তিনটি ছেলেকে—যাহারা মারা গিয়াছে পথের মাঝে নিদারুণ কলেরা রোগে সম্পূর্ণ অসহায় ভাবে, বিনা চিকিৎসায়। বেচারা তাহার স্ত্রীকে খুঁজিয়া পাইবে কি না, কে জানে! আর বৃদ্ধার সাথেই তাহার ছেলের দেখা মিলিবে কি মিলিবে না, ভগবান্‌ই জানেন! যদি না মিলে, বৃদ্ধাকেই বা কে সামলায়? যাক্, অত ভাবিলে আমাদের চলিবে না—আমাদের পরিণামও অন্ধকারে। এখনও অনেক পথ বাকী। কাজেই নিঃশব্দে আগাইয়া চলিলাম।

মেয়েরা কাল যতটা তাড়াতাড়ি হাঁটিয়াছিল, আজ আর ততটা পারিল না। কেবল মেয়েরা নয়, আমার ছেলেমেয়ে—মণ্টু, খুকু ও ঝুণ্টু,—বয়স যথাক্রমে আট, ছয় আর চার—তাহারাও এতটা পথ হাঁটিয়া আসিয়াছে। ঝুণ্টু দুই-একবার কুলীর কাঁধে উঠিয়াছিল কিন্তু তাহাও ইচ্ছার বিরুদ্ধে। আশ্চর্য্য! এত শক্তি আর মনের জোর উহারা পাইল কোথা হইতে?

● **দ্বিতীয় ক্যাম্প**—মাইল তেরো হাঁটিয়া আমরা বেলা দশটায় চি-গন ক্যাম্পে আসিয়া পৌঁছিলাম। কিন্তু সরকারী ক্যাম্পঘরে আশ্রয় পাওয়া গেল না। বর্ম্মীরা ভাড়া দিবার জন্য নদীর ধারে কতকগুলি ঘর উঠাইয়া রাখিয়াছিল। দৈনিক এক টাকা ভাড়াতে তাহারই একটা দখল করিলাম। তিনখানা গরুর গাড়ীর জন্য যথারীতি আরজি পেশ করিয়া নাম রেজেষ্টারী করান হইল। গাড়ী পাইতে হইলে অপেক্ষা করিতে হইবে।

আমাদের কুলীর দল এইবার আমাদের ছাড়িয়া আগাইয়া যাইতে চাইল। আমাদের জন্য বেচারাদের যথেষ্ট অসুবিধা হইতেছিল। আমরা একদিনে নয়-দশ মাইলের বেশী যাইতে পারি না, কিন্তু উহারা অক্লেশে বিশ-মাইল পাড়ি দিতে পারে।

কিন্তু গরুর গাড়ী না পাওয়া পর্য্যন্ত উহাদের ছাড়িয়া দিতেও ভরসা হয় না। শেষ পর্য্যন্ত যদি গাড়ী না পাই! তাহা হইলে ছেলেপিলে লইয়া এইখানেই যে আটক থাকিতে হইবে! কাজেই কিছু বেশী বখ্‌শিস্ কবুল করিয়া কুলীদের রাখিয়া দিলাম।

দুইদিন অপেক্ষা করিবার পর খোঁজ লইয়া জানিলাম, আমাদের নাম এখনও অনেক নীচে। পাঁচ-সাত দিনের পূর্ব্বে আমাদের গাড়ী পাইবার আশা নাই। অবশ্য এখানেও চলিতেছে টাকার খেলা! কিন্তু মুস্কিল এই, বেটারা আমাদের কাছ হইতে টাকা নিবে না—আমরা নাকি শিক্ষিত লোক, শেষে

যদি একটা গোলমাল বাধাই! এদিকে দেখছি নাড়ীজ্ঞান খুব টন্‌টনে!

ইহার পরের ক্যাম্পে নাকি নিকটস্থ গ্রামে গরুর গাড়ী পাওয়া যায়। সেখানে কোনরূপ সরকারী বাধ্য-বাধকতা নাই —নিজেরাই দর-দস্তুর করিয়া ভাড়া ঠিক করিয়া লইতে হয়।

দুই দিনের বিশ্রামে মেয়েদের দুর্ব্বলতা কিছুটা কাটিয়া গেল। আর দশ মাইল তাহারা হাঁটিতে পারিবে বলিয়া মত প্রকাশ করিল।

গরুর গাড়ীর ব্যবস্থা করিবার জন্য এই চি-গন ক্যাম্পেই যাত্রীসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

● **অপরূপ দোকানদারী**—বসিয়া থাকিয়া-থাকিয়া যাহারা গাড়ীর আশা ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহারা এইবার অনাবশ্যক মালপত্রগুলি বেচিয়া ফেলিবার জন্য দোকান সাজাইয়া বসিয়াছে। আঠার মাইল রাস্তা কোন প্রকারে বহিয়া আনিয়াছে—আর পারিবে না।

পরের দশ মাইল যাইয়াও যদি দুরদৃষ্টক্রমে গরুর গাড়ী না পাই? কাজেই আমাদেরও কিছু জিনিষপত্র কমান উচিত। জিনিষগুলি যদি এমনি ফেলিয়া না দিয়া বিনিময়ে দু'-এক টাকা পাই—মন্দ কি?

শচীন্দ্র গিয়া বাল্‌তি, থালা, গ্লাস, বাটি ইত্যাদি লইয়া দোকান সাজাইয়া বসিল এবং ওস্তাদ ফেরীওয়ালার মত ছড়া

কাটিয়া খদ্দের আকর্ষণ করিতে লাগিল। আমরা নিজেদের জিনিষ নিজেরা গিয়াই দর-দস্তুর করিয়া মূল্য বাড়াইতে লাগিলাম, আর এই বলিয়া চলিল হাসাহাসি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সমস্ত জিনিষ বিকাইয়া গেল—নিকটবর্ত্তী গ্রামের গৃহস্থ বর্ম্মীরা লাভবান হইল সন্দেহ নাই।

●**আবার পথে**—শেষরাত্রে উঠিয়া আবার যাত্রা সুরু হইল। আমাদের আগে-আগে এক হিন্দুস্থানী দম্পতী চলিয়াছে। বড় বোঁচ্‌কাটাই স্ত্রীর কাঁধে। কিন্তু বেচারা আর পারিতেছিল না, কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল, "আওর নেই শক্‌তা মহারাজ!"

বীরপুঙ্গব স্বামী হুঙ্কার দিয়া উঠিল, "কোওন লাটসাহেবকা বেটি তুম্, নেই শক্‌তা ত কাঁহেকো আয়া?"

উহাদের অতিক্রম করিয়া আগাইয়া চলিলাম। রেণু (আমার স্ত্রী) আমার পাশেই চলিতেছিল। বলিল, "দেখেছ, বেটা কি নচ্ছার! আহা বৌটির জন্য বড় কষ্ট হয়।"

বলিলাম, "মন খারাপ ক'রে লাভ কি বল! আরও কত কি দেখতে হবে কে জানে?"

রাস্তার উভয় পার্শ্বে স্থানে-স্থানে উইটিপির মত তূলার স্তূপ জমিয়া উঠিয়াছে, আর হাওয়ায় ভাসিয়া সেগুলি ছড়াইয়া পড়িতেছে আমাদের চোখে-মুখে।

তূলার স্তূপ কেন?—না, যাত্রীরা বোঝা হাল্কা করিয়াছে।

লেপ, তোষক ও বালিশের তূলা ফেলিয়া দিয়া শুধু ওয়াড় লইয়া তাহারা চলিতে সুরু করিয়াছে। এই ওয়াড়ও কতক্ষণ সঙ্গে রাখিতে পারিবে নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না!

● তৃতীয় ক্যাম্প—এইবার তৃতীয় ক্যাম্পে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সর্ব্বশুদ্ধ আমাদের বত্রিশ মাইল হাঁটা হইল।

মেয়েরা আর পারে না—তাহাদের পা টন্‌টন্ করিতেছে। যেমন করিয়াই হউক, এখান হইতে গরুর গাড়ীর বন্দোবস্ত করিতেই হইবে। পথের ধূলায় আমাদের চেহারাগুলি হইয়া উঠিয়াছে কিম্ভূত-কিমাকার—হোলিখেলা-মত্ত হিন্দুস্থানীদের মত!

একটু ভাল করিয়া স্নান করিয়া লইব ভাবিলাম, কিন্তু হইয়া উঠিল না। শীর্ণপ্রায় পাহাড়ী খাল—চিক্‌চিক্ করিয়া জল আসিতেছে—পা ডোবে, কি ডোবে না! একঘটি জল তুলিয়া মাথায় দিতে গেলে লোকের ভীড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে হয়। বুঝিলাম, এইখান হইতেই আমাদের জলকষ্ট সুরু হইল।

গরুর গাড়ীতে

(তৃতীয় ক্যাম্প হইতে পান্থা-ক্যাম্প : ৪০ মাইল)

●গাড়ীর বন্দোবস্ত—দুপুরের খাওয়া-দাওয়া চুকিয়া গেলে গরুর গাড়ীর খোঁজে বাহির হইলাম। ক্যাম্পের বাহিরেই গাড়ীর দালাল ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিল। পান্থা-ক্যাম্প পর্য্যন্ত এক-একখানা গাড়ীর ভাড়া পঞ্চাশ টাকাতে রফা হইল। পান্থা এখান হইতে চল্লিশ মাইল। আমরা তিনখানা গরুর গাড়ী ভাড়া করিলাম।

পান্থার বিশ মাইল দূরে টামু—বর্ম্মার শেষপ্রান্ত। কিন্তু টামু পর্য্যন্ত গরুর গাড়ী যাইবে না—পুলিশের হুকুম নাই। কেন নাই, ভগবান জানেন।

সন্ধ্যার সময় একটা মজার ব্যাপার ঘটিল। স্থানীয় তিনটি বর্ম্মী স্ত্রীলোক আমাদের ক্যাম্পে বেড়াইতে আসিল। পোষাক-পরিচ্ছদে উহাদের অবস্থাপন্ন ঘরের বলিয়াই মনে হইল। আমার তিন মাসের মেয়েটিকে দেখিয়া উহারা কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। বলিল, "এইটুকু মেয়ে নিয়ে তোমরা বাংলাদেশ পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারবে না—রাস্তায়ই মারা যাবে। আমাদের কাছে রেখে যাও—মানুষ করি।"

কথাটা আমরা হাসি ঠাট্টা বলিয়াই উড়াইয়া দিতেছিলাম;

কিন্তু উহারা অসম্ভব জেদ করিতে লাগিল দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। উহারা এমনও বলিল যে, মেয়েটির বাবদ উহারা উচিত দাম ধরিয়া দিতেও প্রস্তুত।

বাধ্য হইয়া এইবার একটু কড়া জবাব দিতে হইল। বলিলাম, "ছেলেমেয়ে বেচা আমাদের ব্যবসা নয়—রাস্তায়ও ফেলে যাই না—আমরা বর্ম্মী নই।"

আমাদের মেজাজ দেখিয়া উহারা হতাশ হইল। তারপর মেয়েটিকে একটু আদর করিয়া কোল হইতে নামাইয়া দিয়া উহারা চলিয়া গেল।

রেণু ত' চটিয়া আগুন! বলিল, "দেখেছ বেটীদের আস্পর্দ্ধা! মা'র চেয়ে বেশী আদর, তার নাম ডাইনী! বর্ম্মী ভাষাটা ভাল জানিনে; তা না হ'লে শুনিয়ে দিতাম আচ্ছা ক'রে।"

●যাত্রা সুরু—একটু রাত্রি থাকিতেই গাড়োয়ান আসিয়া আমাদের জাগাইয়া তুলিল। গাড়ীগুলি নেহাৎ মন্দ নয়, তবে চল্লিশ মাইল পর্য্যন্ত বলদগুলির আহার্য্য খড়কুটা গাড়ীর মেঝেতে পুরু করিয়া বিছান। আমরা যখন কম্বল বিছাইয়া বসিতে গেলাম তখন আমার আর হরেন সেনের মাথা গাড়ীর ছইয়ে ঠেকিয়া গেল। দলের মধ্যে আমরা দুইজনই সবচেয়ে লম্বা। যা হোক, কোন রকমে চাপিয়া বসা গেল—শুইয়া পড়িলে আর অসুবিধা হইবে না।

স্ত্রী-পুত্র সহ আমি এক গাড়ীতে উঠিলাম; মণ্টুকে লইয়া

সেনবাবুদ্বয় উঠিলেন আর-এক গাড়ীতে। শচীন্দ্র তাহার ছেলেমেয়ে লইয়া উঠিল অন্য এক গাড়ীতে। জিনিষপত্র ভাগ করিয়া তিন গাড়ীতেই দেওয়া হইল।

উড়িয়া কুলীদিগকে টাকা-পয়সা মিটাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছি কিন্তু বলিয়া দিয়াছি, পাম্বা-ক্যাম্পে যদি আমাদের জন্য অপেক্ষা করে, তবে মোটা রকম একটা বখ্‌শিস্‌ দিব। অপেক্ষা যে তাহারা আর করিবে না, আমরাও জানি। যাহা হউক, বিশ মাইল কোন রকমে পাড়ি দেওয়া যাইবে।

টামু হইতে নাকি মণিপুরী কুলী পাওয়া যায়। টামু পৌঁছিতে পারিলে জিনিষপত্রের জন্য আর ভাবনা নাই। সেনবাবু থাকায় কালেওয়া হইতেই আমরা কুলী পাইয়াছি, কাপড়-চোপড়ও কিছু-কিছু সঙ্গে আনিতে পারিয়াছি। আর কোন পরিবার কুলী যোগাড় করিতে পারে নাই। সমস্ত ফেলিয়া দিয়া এক কাপড়েই তাহাদিগকে যাত্রা করিতে হইয়াছে। রান্না করিবার জন্য যে সামান্য দুই-একখানা বাসনপত্র, তাহাও তাহাদের পক্ষে দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে। উহাদের পথ-কষ্টের সীমা নাই। আমাদের অদৃষ্ট তবু ভাল। সেনবাবু সঙ্গে না থাকিলে কি-যে হইত, ভাবিতেও পারি না।

আমাদের তিনখানা গাড়ী পর-পর চলিয়াছে। সম্মুখে ও পশ্চাতে আরও বহু গাড়ী। বলদের গলার ঘণ্টাগুলি একযোগে বাজিয়া চলিয়াছে টিং-টিং-টিং! সমস্ত বনপথ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। এই একমাত্র শব্দ—আর কোথাও কোনরূপ

শব্দ নাই। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েগুলি গাড়ীর মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

এখনও একটু রাত্রি আছে। অন্ধকারেই দেখা যাইতেছে আমাদের এই শ্রেণীবদ্ধ গাড়ীর আশেপাশে আরও অগণিত যাত্রী চলিয়াছে—নগ্নপদে। কারণ, গাড়ী-ভাড়া করিবার মত পয়সা ত' সকলের নাই! উহাদের সঙ্গে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েও আছে—ঘুমে হয়ত চোখের পাতা বুজিয়া আসিতেছে কিন্তু তবু চলিতে হইবে।

অবোধ শিশুর দল,—কিন্তু আজ উহারাও জানে উহাদের কি বিপদ! স্পষ্ট ধারণা হয়ত নাই; কিন্তু পিতামাতার মুখে আতঙ্কের ছায়া দেখিয়া উহারাও আশঙ্কিত! হয়ত ধারণা করিয়া লইয়াছে পেছন দিক হইতে কোন দৈত্য তাড়া করিয়াছে—মাথার উপরে খড়গ ঝুলিতেছে, ছুটিয়া না পলাইলে আর নিস্তার নাই!

ক্রমে উষার আলো ফুটিয়া উঠিল। দেখা গেল—শত-শত গরুর গাড়ীর চাকা হইতে ধূলি উত্থিত হইয়া এক বিরাট কুয়াসার সৃষ্টি হইয়াছে।

● **বন্ধুর পথ**—পথটা এ পর্য্যন্ত প্রায় সমতল ছিল, কিন্তু এইবার চড়াই-উৎরাই সুরু হইল। এখনও পাহাড় আরম্ভ হয় নাই, তথাপি রাস্তা অসম্ভব রকম বিশ্রী। এই শ্বাপদ-সঙ্কুল বিজন অরণ্যের মধ্য দিয়া এককালে হয়ত কোন পথই ছিল না—থাকিলেও পায়ে-চলার মত সরু একটা পথ হয়ত ছিল। অবিরাম

জনস্রোত আর গরুর গাড়ী চলিতে-চলিতে এই সরু পথটাই এখন খানিকটা প্রশস্ত হইয়াছে। গাছ কাটিয়া ফেলা হইয়াছে কিন্তু গোড়াগুলি পথের মাঝেই হাঁ করিয়া আছে। ইহাদের উপর দিয়াই গরুর গাড়ী চলিতেছে।

রাস্তা কোনখানে উঁচু, কোনখানে নীচু। মাঝে-মাঝে পথের বুক চিরিয়া আড়াআড়ি ভাবে খাল চলিয়া গিয়াছে। একটু বৃষ্টি হইলেই এইগুলিতে জলের বান ডাকে—কিন্তু এখন তাহা শুষ্ক ও কঠিন।

গরুর গাড়ীর কিন্তু সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নাই—এইগুলি স্বচ্ছন্দে পার হইয়া যাইতেছে অবাধগতি যুদ্ধের ট্যাঙ্কের মত। আমরা গাড়ীর মধ্যে বসিয়া অনিচ্ছায় তাণ্ডব নৃত্য করিয়া চলিয়াছি। দূরে একটা খাল দেখিলেই গরুর গাড়ীর কোন একটা কাঠ আঁকড়াইয়া ধরিয়া চোখ বুজিয়া থাকি—পার হইলেই মনে হয়, মস্ত-বড় একটা বিপদ্ কাটিয়া গেল।

আমাদের পেছনের একটা গাড়ী হইতে ঘটাং করিয়া একটা বালতি ছিট্‌কাইয়া রাস্তায় পড়িয়া গেল। গাড়ীর আচম্‌কা উল্লম্ফনে দুই-তিনটি শিশু একযোগে চীৎকার করিয়া উঠিল। আমাদের তিন-চারিখানা আগের এক গাড়ী হইতে হঠাৎ আবার একটা চাকা খসিয়া গেল! গাড়ীটা রাস্তার উপরেই হুমড়ি খাইয়া পড়িল। আরোহিণী একটি মোটা স্ত্রীলোক, পথের ধূলায় ডিগ্‌বাজী খাইয়া উঠিলেন। আমরা পাশ কাটাইয়া চলিতে লাগিলাম।

● **চতুর্থ ক্যাম্প**—বেলা বারোটার সময় আমরা পরবর্ত্তী ক্যাম্পে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, কালেওয়াতে ইভাকুইজদের 'রেশন্ টিকেট' দেওয়া হইয়াছিল। এই টিকেট দেখাইয়া প্রত্যেক ক্যাম্প হইতে দলের লোকসংখ্যা-অনুযায়ী চাল-ডাল, তেল-নূন মিলিবে বলিয়া আশ্বাস পাওয়া গিয়াছিল; কিন্তু পরে কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল, কোন ক্যাম্পেই একযোগে এই চারিটি অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ পাওয়া যায় না।

পর-পর পাঁচটি ক্যাম্পের মধ্যে মাত্র একটিতে খানিকটা তেল আর একটুখানি নূন পাইয়াছিলাম। ডাল-চাল যাহা পাইয়াছিলাম তাহা কদর্য্য, প্রচুর পরিমাণে পাথরের কুচি মিশান। তবে পথের পরিশ্রমে যেরূপ ভীষণ ক্ষুধার উদ্রেক হয়, তাহাতে লোহা খাইয়াও হজম করিবার কথা, কদন্ন ত' কোন্ ছার!

হজম করিয়া চলিলাম বটে, কিন্তু আমাশয় দেখা দিল। খবর লইয়া জানিবার প্রয়োজন হইল না, স্বচক্ষেই প্রমাণ পাইলাম ইভাকুইজদের প্রায় বারো আনাই আমাশয়ে আক্রান্ত। রোগটা শুধু চাল-ডালের জন্য নয়, জলের জন্যও বটে। অরণ্যের মধ্য দিয়া পাতা-পচা জল নালার আকারে চিক্‌চিক্ করিয়া সাপের মত বাঁকিয়া চলে, অথচ সেই জলই একমাত্র পানীয়।

● **পঞ্চম ক্যাম্প**—পঞ্চম ক্যাম্পে উপস্থিত হইয়াই, আমি একটা ঘরে ঢুকিয়া আমার বিছানাটা ছড়াইলাম কিন্তু পরক্ষণেই

গুটাইয়া ফেলিতে হইল। নিকটেই একটা আমাশয়ের রোগী কম্বল মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছে, হাজার-হাজার মাছি তাহাকে ঘিরিয়া ভন্‌ভন্‌ করিতেছে।

আর-একটা ঘরে ঢুকিলাম কিন্তু সেখানেও এই অবস্থা। অগত্যা ঐ দিনকার মত একটা গাছতলাতেই আশ্রয় লইতে হইল।

ইভাকুইজদের জন্য ক্যাম্পে ডাক্তারও আছে দেখিলাম; কিন্তু কোটপ্যাণ্ট-পরিহিত মাদ্রাজী ডাক্তার-পুঙ্গবের ভাবভঙ্গী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না ঔষধ আছে কি না!

রান্নার যোগাড় করা গেল। ইন্দ্রদেও চুলায় আগুন দিতেই যমদূতের মত দুইজন বর্ম্মী ক্যাম্প-ওয়ার্ডার ছুটিয়া আসিয়া সদর্পে জানাইল, "সাহেবের হুকুম, আগুন জ্বালাতে পারবে না। সব খড়ের ঘর, ক্যাম্পে আগুন ধরতে পারে।"

ইন্দ্রদেও সমান তেজে বলিয়া উঠিল, "সে খেয়াল আমাদের আছে। আগুন জ্বালব না ত', না খেয়ে থাক্‌ব নাকি? নিয়ে আয় তোর সাহেবকে।"

সাহেবের আর টিকি দেখা গেল না।

শালপাতার মত একরকম পাতায় সবেমাত্র ভাত ঢালা হইয়াছে, এমন সময় একটা মড়াকে চ্যাং-দোলা করিয়া দুইজন লোক আমাদের কাছ দিয়াই লইয়া গেল। আর নিবি ত' নে, একরকম আমার পাত ঘেঁসিয়াই! মাছির ঝাঁক ছুটিয়া চলিয়াছে মড়ার পিছু-পিছু!

তখনই ভাতের পাতাটা টান্ মারিয়া জঙ্গলে ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

● বর্ম্মী গাড়োয়ানের শয়তানী—রাত্রি থাকিতেই বিছানাপত্র বাঁধিয়া গরুর গাড়ীর কাছে গিয়া হাজির হইলাম। গাড়ীর মধ্যে তখনও গাড়োয়ানদের নাক ডাকিতেছে। প্রায় পনের মিনিট ডাকাডাকির পর তাহারা উঠিল। অন্যান্য গাড়ীগুলি তখন রওনা হইয়া গিয়াছে। প্রায় মাইল দুই গিয়া একটা খালের কাছে আমাদের গাড়ী তিনখানি থামিল।

চারিদিক বেশ ফর্সা হইয়া গিয়াছে—আমাদের আগে-পিছে আর একখানা গাড়ীও দেখা যায় না। গাড়োয়ানগুলি আরও অনর্থক দেরী করিতে লাগিল। তাড়া দিতেই আগের গাড়ীর গাড়োয়ানটা গম্ভীর ভাবে বলিয়া বসিল, দেহটা তাহার ভাল নাই, আজ আর বোধহয় চলিতে পারিবে না।

হতভাগা বলে কি? দলছাড়া হইয়া এই জঙ্গলের মধ্যে পড়িয়া থাকিতে হইবে! কিন্তু বক্তার চোখে-মুখে ত' কোন অসুখের লক্ষণ দেখা যাইতেছে না!

মাণিকরাজ পায়ে হাঁটিয়া আমাদের সঙ্গে-সঙ্গেই চলিয়াছিল। চটিয়া গিয়া চীৎকার করিয়া আমাকে বলিল, "বাবু, এ-সব স্রেফ্ চালাকী। অসুখ-বিসুখ সব বাজে কথা—বেটাদের নাড়ী-নক্ষত্র আমার জানা আছে।"

সে তারপর ইন্দ্রদেওকে ডাকিয়া বলিল, "আও ভাইয়া, গরুর পিঠে লাঠি না পড়লে গরু চলে না; আজ গাড়োয়ানের পিঠেই লাঠি পড়বে।"

আমি নামিয়া পড়িয়া মাণিকরাজকে থামাইলাম, নিম্নকণ্ঠে বলিলাম, "শিশু ও মেয়েদের নিয়ে চলেছি—একটা হাঙ্গামা করা ভাল হবে না। কাছেই একটা বর্ম্মী বস্তী, হয়ত লোক জড় হবে। শেষ পর্য্যস্ত যদি গাড়োয়ান না যেতেই চায়, কি আর করা যাবে? মারামারি ক'রে তো আর রাজী করান যাবে না!"

আমি গাড়োয়ানকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হে তোমাদের মতলব কি? আমাদের কি কায়দায় পেয়েছ নাকি? এই কি ভগবান্ বুদ্ধদেবের শিক্ষা?"

গাড়োয়ান একটু নরম হইল, কিন্তু 'চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী!' বলিল, "যাব না কেন বাবু, কিন্তু গাড়ীপিছু আর দশটি ক'রে টাকা বেশী দিতে হবে। আমরা বড় ঠকে গেছি।"

আসল মতলবটা পূর্ব্বেই আঁচ্ করিয়াছিলাম। বর্ম্মীদের চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা কম নয়। কিন্তু কি করা যায়! স্থান, কাল আর পাত্র বিবেচনা করিয়া এখন চলিতে হইবে। কাজেই দশ টাকা করিয়া বেশী দিতে রাজী হইলাম—তিন গাড়ীতে ত্রিশ টাকা আরও বেশী গেল।

টাকা ট্যাঁকে গুঁজিয়াই গাড়ীওয়ালারা দ্রুত গাড়ী হাঁকাইল

এবং এক ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের দলের অন্যান্য গাড়ীগুলিকে ধরিয়া ফেলিল! 'সিলভার-টনিকে'র গুণে গাড়োয়ানের দেহে আর কোন অসুখ নাই!

● **ষষ্ঠ ক্যাম্প**—আবার একটি ক্যাম্পে পৌঁছিয়া কিছু আলু, গুড় ও সরিষার তেল কিনিলাম—সেরপ্রতি মূল্য যথাক্রমে দুই টাকা, পাঁচ সিকা ও ছয় টাকা। পাওয়া যে গেল, এই যথেষ্ট!

● **পান্থা-ক্যাম্প**—ক্রমাগত চারিদিন গরুর গাড়ীতে চলিয়া পান্থা-ক্যাম্পে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এইখান হইতেই গাড়ীওয়ালারা বিদায় লইল।

আবার বিশ মাইল আমাদের হাঁটিতে হইবে। কিন্তু সেও ভাল—গরুর গাড়ীর ঝাঁকানিতে সমস্ত গা ব্যথা হইয়াছে—পা সটান্ করিয়া দাঁড়াইতে পারিলে এখন বাঁচি!

সারা ক্যাম্প ঘুরিয়া দেখিলাম, উড়িয়া কুলীরা কেউ আমাদের জন্য অপেক্ষা করে নাই, তাহারা সকলেই চলিয়া গিয়াছে। একবার যখন হাতছাড়া করিয়াছি, তখন আর যে পাইব না—তাহা একরকম জানাই ছিল। কাজেই এইবার নিজেদেরই শক্তি-পরীক্ষা দিতে হইবে।

"বাবু…আমার ট্যাঁকের জালিতে এক হাজার মোহর আছে।"

হাঁটাপথে পুনরায়

(পাস্থা হইতে বার্ম্মার শেষ প্রান্ত—টামু : ২০ মাইল)

● **আয়োজন**—আমাদের সঙ্গে দুইটি ব্রহ্মদেশীয় হোগ্‌লা-পাতার পেটিকা ছিল—জামা-কাপড় বোঝাই। ঐ দুইটি খুলিয়া ফেলিয়া উহার মধ্য হইতে কয়েকটা দামী জামা ও শাড়ী বাছিয়া লইলাম এবং কম্বল দিয়া একটা বোঁচ্‌কা করিয়া কাবুলীওয়ালার মত নিজের পিটে বাঁধিলাম।

তিন মাসের শিশু-কন্যাটিকেও লইলাম নিজে। আড়াই বছরের মেয়েটিকে লছমী পিঠে বাঁধিয়া লইল। বাসন-পত্র যাহা না হইলে চলে না, ভাগাভাগি করিয়া দুই সেনবাবু লইলেন। ইন্দ্রদেও আর মাণিকরাজের পিঠে তাহাদের নিজেদের বোঁচ্‌কা, তৎসত্ত্বেও ঝুণ্টুকে তাহারা দুইজনে অদল-বদল করিয়া কাঁধে লইবে স্থির হইল। রেণুর ভাগে পড়িল ছোট-ছোট দুইটা শান্‌-ব্যাগ।

অবশেষে খুব ভোরে উঠিয়া যাত্রা করিলাম। জামা-কাপড়ের স্তূপ, বালিশ, কম্বল, হারিকেন, বাল্‌তি পড়িয়া রহিল—ফিরিয়াও তাকাইলাম না।

● **টামু**—দুই দিনের দিন টামু আসিয়া যখন পৌঁছিলাম তখন রীতিমত হাঁপাইতেছি—জিভ্‌ যেন বাহির হইয়া আসিতে চায়।

কেহ কাহারও মুখের দিকে আর সাহস করিয়া তাকাইতে পারি না।

টামু খুব ছোট সহর। এদিকে এই বার্ম্মার শেষপ্রান্ত। এখানে কণ্ঠাইও পোষ্টাফিস্, সরকারী হাসপাতাল ও থানা আছে। তখন লোকের ভীড় এত যে, বাজারে খাবার-দাবার প্রায় কিছুই মিলে না।

● **অনুমতি-পত্র**—টামু সহর হইতেই মণিপুর-রাজ্যে প্রবেশের অনুমতি-পত্র নিতে হয়। কাজেই সেনবাবু সকলকে সঙ্গে লইয়া ইভাকুইজ ক্যাম্পের দিকে রওনা হইলেন; তাহা সহর হইতে মাইলখানেক দূরে। অনুমতি-পত্রের জন্য আমি রহিয়া গেলাম।

পোষ্টাফিসের নিকটেই অনুমতি-পত্র দিবার অফিস বসিয়াছে। প্রায় পাঁচশ' লোক লাইন-বন্দা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এই এক-এক টুক্‌রা কাগজের জন্য! ভাবিয়া পাইলাম না মণিপুর এমন কি একটা স্বর্গরাজ্য যে, ছাড়পত্র ছাড়া সেখানে প্রবেশ নিষেধ! ইভাকুইজরা যেখানে প্রাণ হাতে লইয়া চলিয়াছে ভারতের দিকে, যথাসর্ব্বস্ব পেছনে ফেলিয়া—সেখানে এই প্রহসন কেন বুঝিলাম না।

অনুমতি-পত্র পাইতে হইলে কলেরার টিকার টিকেট দেখাইতে হয়। কাজেই ঐ টিকেটটা হাতে করিয়া ভীড়ের মধ্যে গিয়া সারি দিয়া দাঁড়াইলাম।

প্রায় ঘণ্টাদুই অপেক্ষা করিবার পর অনুমতি-পত্র পাওয়া

গেল। কাগজের চেহারায় বিশেষ কোন পারিপাট্য নাই—শুধু লেখা রহিয়াছে—

M. R. Chakrabarty is permitted to enter Manipur with sixteen members. Males—6, Females—3, Children—7.

বর্ম্মার শেষ সীমানা পর্য্যন্ত যে পায়ে হাঁটিয়া পৌঁছিয়াছি, এই সংবাদ দিয়া বাড়ীতে দাদার কাছে একটা টেলিগ্রাম করিবার জন্য পোষ্টাফিসে গিয়া হাজির হইলাম। কিন্তু শুনিলাম, টেলিগ্রাফ-লাইন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে—দুই দিন পূর্ব্বে মান্দালয় সহর জাপানী বোমার ঘায়ে চূরমার হইয়া গিয়াছে—টাঙ্গু সহরে ভীষণ লড়াই চলিতেছে—জাপানীরা ক্রমেই উপরের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে উল্কা-গতিতে। দেখিলাম, পোষ্ট-মাষ্টারও পোঁটলা-পুঁটলী বাঁধিতেছেন। ভদ্রলোক পূর্ব্বে পরিবার পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, কাজেই এতদিন টিকিয়া ছিলেন। যাহা হউক, ক্যাম্পে গিয়া হাজির হইলাম।

● টামু ক্যাম্প—একটা পাতলা ধরণের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ক্যাম্প করা হইয়াছে। প্রকাণ্ড সেগুন বৃক্ষের ফাঁকে-ফাঁকে অনেকগুলি ঘর। কাছেই পাহাড়ী নদী—একহাঁটু জল; কিন্তু বেশ চওড়া। কাক-চক্ষুর মত স্বচ্ছ জল তর্‌তর্‌ গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। ঝির্‌ঝিরে বনের হাওয়ায় শরীরটা জুড়াইয়া গেল।

এইটাই সবচেয়ে বড় ক্যাম্প। এখান হইতে চৌদ্দ মাইল গেলেই পাহাড় সুরু। পাহাড়ের উপর দিয়া একাদিক্রমে ছাপ্পান্ন মাইল অতিক্রম করিলে আবার সমতল ক্ষেত্র মণিপুর-রাজ্য মিলিবে।

চৌদ্দ মাইল পরের ক্যাম্পটা তত ভাল নয়, কাজেই এইখানেই ইভাকুইজদের দম লইয়া পাহাড় পার হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়।

ছাপ্পান্ন মাইল চড়াই-উৎরাই পাহাড়ের নাম শুনিয়াই আমাদের মুখ শুকাইয়া আমসি হইয়া গেল! পাহাড়ের মূর্ত্তিটা কল্পনা করিয়া শিহরিয়া উঠিলাম! মনশ্চক্ষুর উপর ভাসিয়া উঠিল শত-শত ইভাকুইজ পাহাড়ের গায়ে এখানে-সেখানে হেলান দিয়া মরিয়া রহিয়াছে! এতদূর আসা তবে কি বৃথা হইল?

এখান হইতে চৌদ্দ মাইল ক্যাম্পে যাইবার জন্য সরকারী ব্যবস্থায় গরুর গাড়ী ও মণিপুরী কুলী পাওয়া যায়। তুলসীর মালা গলায় শত-শত মণিপুরী কুলী দেখিয়া খানিকটা আশ্বস্ত হইলাম। মনে হইল, এইত' আপনার জনের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি, তবে আর ভয় কি?

কেবল কুলীই নয়,—দেখিলাম, বহু মণিপুরী লোক ঘুরিয়া-ঘুরিয়া চিঁড়া, গুড়, মুড়ি ইত্যাদি বিক্রয় করিতেছে। ইহাদের মধ্যে মণিপুরী স্ত্রীলোকও আছে। ভাবিলাম, উহারা যখন পাহাড় পার হইয়া আসিতে পারিতেছে, তখন আমরা কি যাইতে পারিব না?

আবার একটা আশার আলো দেখা গেল। চৌদ্দ মাইল ক্যাম্পে নাকি শিশু ও মেয়েদের জন্য ডুলি পাওয়া যায়। চারিজন করিয়া মণিপুরী কুলী এক-একটা ডুলি বহন করে। তবে আর চিন্তা কি? টাকা যখন হাতে আছে, ডুলির যোগাড় হইবেই। চৌদ্দ মাইল ক্যাম্পে যাইবার গরুর গাড়ীর জন্য নাম রেজেষ্টারী করিলাম।

এখান হইতে মণিপুর-রাজ্যে পৌঁছিবার আর একটা রাস্তা আছে। তাহার নাম—পেলেল রোড্। এই রাস্তার দূরত্ব মাত্র ছত্রিশ মাইল কিন্তু উহা 'লেডিজ' ও 'জেণ্টল্‌ম্যান্'দের জন্য অর্থাৎ সাদা চামড়ার জন্য। ঐ রাস্তাটায় আমাদের মত কুলী-ক্লাশের লোকের পদার্পণ নিষেধ। ঐ রাস্তাটাও পাহাড়ের উপর দিয়াই গিয়াছে, কিন্তু মাঝে-মাঝে বিশ্রামের ও খাওয়া-দাওয়ার সুন্দর সরকারী ব্যবস্থা আছে।

জেণ্টল্‌ম্যান্ প্রমাণ দিতে পারিলে দুই-একজন ভারতীয়কেও ঐ পথে যাইতে দেওয়া হয়। দরখাস্ত হাতে করিয়া এই কাঙালপনা করিলে আমরা কয়েকজন হয়ত ঐ পথের অনুমতি পাইতাম; কিন্তু তাহা করিতে গেলে দলের আর সকলকে ছাড়িয়া যাইতে হয়।

না, একসঙ্গে যখন যাত্রা করিয়াছি, একসঙ্গেই যাইব।

মণিপুরের পথে

● **যাত্রা সুরু**—তিন দিন বসিয়া থাকিবার পর খবর লইয়া জানিলাম, গরুর গাড়ী পাইতে আমাদের আরও দুই-তিন দিন দেরী হইবে। কিন্তু আমরা ইতিমধ্যেই চাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছি, জাপানীরাই বা কতদূর আসিল কে জানে? আর বসিয়া থাকা চলে না।

পঁচিশ টাকা সেলামী দিয়া একখানামাত্র গরুর গাড়ী যোগাড় করিলাম। চারজন মণিপুরী কুলীও পাইলাম। সবই যখন যোগাড় হইল, তখন সেই দিনই শেষরাত্রে আমরা মণিপুর রওনা হইলাম।

● **চৌদ্দ মাইল ক্যাম্প**—বাকি রাতটুকু আমাদের পথেই কাটিয়া গেল। পরের দিন বেলা এগারটায় চৌদ্দ মাইল ক্যাম্পে গিয়া পৌঁছিলাম।

এইখানেও নাম রেজেষ্টারী করিবার অভিনয়। তিনখানা ডুলি ও ষোলজন কুলীর উমেদার হইয়া আরজি পাশ করা গেল। কিন্তু ডুলির চেহারা দেখিয়াই রেণু উহাতে উঠিতে ভয় পাইল।

বাঁশের মাচার উপর ফাঁক-ফাঁক কঞ্চির ছই—মোটেই

মজবুত নয়। চাহিদার আধিক্যে যেমন-তেমন করিয়া তাড়াতাড়ি তৈরী হইয়াছে। উহারই তিনখানা বারো টাকা দিয়া কিনিলাম এবং আর-এক টাকা খরচ করিয়া একটু শক্ত করিয়া বাঁধাইয়া লইলাম। ছইয়ের উপর কম্বলের আবরণ দেওয়া হইল।

প্রথম ডুলিতে রেণু তিনমাসের মেয়েটিকে লইয়া উঠিল। দ্বিতীয় ডুলিতে মণ্টু, খুকু ও ঝুণ্টু উঠিল এবং তৃতীয়টিতে উঠিল শচীন্দ্রের স্ত্রী। মুকুলকে একজন কুলী পিঠে বাঁধিয়া লইল। কুলীরা "রাধেকৃষ্ণ, রাধেকৃষ্ণ" বলিয়া ডুলি উঠাইল।

টামু হইতে গোড়ায় লোহা-লাগানো এক-একটা পাহাড়ী লাঠি আমরা কিনিয়া আনিয়াছিলাম। এই লাঠি হাতে ডুলির অগ্রপশ্চাৎ আমরা চলিতে লাগিলাম বরকন্দাজের মত।

আমাদের আগে-পিছে আরও অনেক ডুলি চলিয়াছে,—সে এক বিরাট শোভাযাত্রা। ডুলির ছইগুলি কোনটা লাল, কোনটা নীল, আবার কোনটা নানান্ রঙ মিশান। দৃশ্যটা বড়ই উপভোগ্য।

ইন্দ্রদেও চলিয়াছে মণ্টুদের ডুলির পিছে-পিছে। সে মাঝে-মাঝে উহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছে যেন চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

টামু-ক্যাম্পে লছমীর সঙ্গে আমাদের ছাড়াছাড়ি। ঐখানে ওর মাসীর সঙ্গে দেখা হয়। সঙ্গে মেসোও আছে, নাম নটরাজন বা আলাগিরী স্বামী বা ঐরকম একটা কিছু। মাসীর তখন পা ফুলিয়া উঠিয়াছে।

লছমীকে দেখিয়াই সে হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, আর কিছুতেই তাহাকে ছাড়িবে না। লছমী দোটানায় পড়িয়া যখন ইতস্তত: করিতেছে, তখন আমরাই তাহাকে বিদায় দিলাম।

হতভাগিনী তাহার তাড়িখোর স্বামীকে ডাইভোর্স করিবার পর একটানা তিন বছর আমাদের সঙ্গে ছিল। ছেলেমেয়েগুলিও ওর খুবই অনুগত ছিল। আজ পাহাড়ী রাস্তায় চলিতে-চলিতে ওর অভাবটা পদে-পদে অনুভূত হইতে লাগিল।

●'চড়াই' আরম্ভ—চৌদ্দ মাইল ক্যাম্প ছাড়িয়া পোয়াটেক মাইল যাইতেই কালো ধূসর রঙের এক বিরাট পাহাড় আমাদের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। একটা প্রকাণ্ড মহিষ যেন হঠাৎ সশৃঙ্গ নতশিরে 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া আমাদের আহ্বান করিল। কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া এই কুপিত মহিষের পৃষ্ঠে একে-একে আমরা আরোহণ করিলাম।

প্রায় এক ঘণ্টা চলিবার পর চড়াই আরম্ভ হইল। স্থানে-স্থানে এরূপ খাড়া পাহাড়ের উপর দিয়া পথ চলিয়া গিয়াছে যে, তাহার উপর আরোহীসহ ডুলি উঠান অসম্ভব। কাজেই ঐসব স্থানে ছেলেমেয়েদের নামিয়া হাঁটিয়া পার হইতে হইল।

এতক্ষণ আমার শিশুকন্যাটি আমার কোলেই ছিল কিন্তু আর পারিলাম না। একজন কুলীর পিঠে উহাকে সাবধানে একটা মোটা চাদর দিয়া বাঁধিয়া দিলাম। কিন্তু তাহার কোন অসুবিধা হইতেছে বলিয়া মনে হইল না, দিব্যি ঘুমাইতে লাগিল!

টাঙ্গু হইতে ত্রিশ মাইল দূরে এক স্বাস্থ্যকর স্থান আছে। তাহার নাম 'থানডং' পাহাড়। মনে হইল, তিন বন্ধু একবার উক্ত পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়াছিলাম পদব্রজে। পাহাড় ঘেরিয়া

পায়ে-চলার পথ ও মোটর-রোড থাকা সত্ত্বেও সখ করিয়া খাড়া পাহাড়ের উপর দিয়া পাঁচ মাইল অতিক্রম করিয়াছিলাম।

সেদিন প্রত্যেকের কাঁধে শান-ব্যাগে ছিল কমলা লেবু আর কলা। পা চলার সঙ্গে-সঙ্গে মুখও চলিতেছিল বেশ। তথাপি থানৃডং পৌঁছিয়া দুই দিন পর্য্যন্ত গা-ব্যথা ছিল। কিন্তু আজ? আজ ফ্লাস্কে জল ছাড়া জিভ্ ভিজাইবার আর কিছুই সঙ্গে নাই। কৃপণের ধনের মত উহাই একটু-একটু করিয়া খরচ করিতেছি।

● **ঢালু পথে**—নয় মাইল গেলে ক্যাম্প পাওয়া যাইবে, অথচ পথ যেন আর ফুরাইতে চাহে না! সাত মাইল গিয়া একটু-একটু নামিতে লাগিলাম। অনেক নীচে ক্যাম্প দেখা গেল শিশুদের খেলার ঘরের মত।

হরেন সেন আমাদের আস্তে-আস্তে নামিতে বলিয়া নিজে জোরে পা চালাইয়া দিলেন—একটা ভাল ঘর দখল করিতে হইবে, আজ পা ছড়াইয়া শুইতে না পারিলে গায়ের ব্যথা কমিবে না।

ছেলেবেলায় আমরা একটা ছড়া বলিতাম—

"আগে গেলে বাঘে খায়,
পিছে গেলে সোনা পায়।"

কথাটার তাৎপর্য্য কি, কে জানে? কিন্তু এই পাহাড়ী রাস্তার একমাত্র বুলি, "আগে চল, আগে চল্।" একবার বসিয়া পড়িয়াছ কি, আর উঠিতে ইচ্ছা হইবে না। পিছে পড়িয়া থাকিলে ক্যাম্পের চালার নীচে মাথা গুঁজিবার ঠাঁই মিলিবে

না। এই জন-মানবহীন পাহাড়ে একটুখানি ঢালু জায়গায় ইভাকুইজদের জন্য যে দুই-একখানি কুটীর বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাই ইন্দ্রপুরী বলিয়া মনে করিতে হইবে। ইহার বেশী কখনো আশা করা যায় না, করাও অন্যায়।

● **নয় মাইল ক্যাম্প**—ক্যাম্পে পৌঁছিয়াই সটান শুইয়া পড়িলাম, আর উঠিলাম যখন খাবার ডাক পড়িল। স্নান করিবার বালাই নাই, জলের অভাব। কোথায় অনেক নীচুতে পাহাড়ের গা বহিয়া জল চুয়াইতেছে, তাহারই দুই-এক বালতি জল কুলীদের দিয়া আনানো হইয়াছে, রান্নাবান্নার জন্য।

বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া। সন্ধ্যা হইতেই যে শীত পড়িবে তাহার নোটিশ জারি হইতেছে। আজ আমরা আড়াই হাজার ফিট উঁচুতে উঠিলাম।

পরের দিন গা-ব্যথায় শয্যাত্যাগ করা কঠিন হইবে বলিয়া মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু কন্‌কনে শীতল হাওয়ায় শরীরে কোন গ্লানি অনুভূত হইল না। পরের ক্যাম্প মাত্র নয় মাইল দূরে। খানিকটা খাড়াইয়ের পরই মাঝে-মাঝে উৎরাই। ছয় ঘণ্টায় তাহা পার হইয়া আসিলাম।

এইবার আমাদের অগ্নি-পরীক্ষা। এখন সীতা-পাহাড় পার হইতে হইবে,—উচ্চতা প্রায় ছ' হাজার ফিট।

কথাটা শুনিয়াই বুক ঢিপ্-ঢিপ্ করিতে লাগিল। রাত্রিতে মোটেই ঘুম হইল না!

● **সীতা-পাহাড়**—ক্রমেই খাড়াই উঠিতেছি—উচ্চ হইতে উচ্চতর। মাইল-খানেক চলিবার পর চারিদিক ফর্সা হইয়া গেল। দূরে পুঞ্জীভূত কালো মেঘের প্রাচারের ন্যায় সীতা-পাহাড় দেখা গেল। পেছন দিকে মাথা হেলাইয়া উচ্চতা নিরীক্ষণ করিতে হয়—এত উঁচু! এত উঁচু পাহাড় পার হইয়া যাইতে হইবে? মাথা ঘুরিয়া গেল। সীতা নিজে অগ্নি-পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, আর সীতা-পাহাড় পার হইবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে আমাদিগকে!

কেন যে এই পাহাড়ের নাম সীতা-পাহাড় হইল, মণিপুরী কুলী তাহার খবর বলিতে পারিল না। রামায়ণের সীতাদেবীর সঙ্গে এই পাহাড়ের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা কে জানে?

পাহাড়ী লাঠিটা পাষাণ-গাত্রে সজোরে ঠুকিয়া-ঠুকিয়া চলিয়াছি। ট্রেণ ছাড়িবার পর কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত ইঞ্জিনটা যেমন আস্তে-আস্তে হিস্‌হিস্ করিয়া চলিতে থাকে, আমরাও তেমনই এক-পা এক-পা করিয়া শামুকের ন্যায় আগাইয়া চলিতেছি। বারে-বারে ছেলেমেয়েদেরও ডুলি হইতে নামিতে হইতেছে।

● **বিপজ্জনক পথে**—মাঝে-মাঝে অতি সঙ্কীর্ণ রাস্তা। একদিকে পাহাড়ের প্রাচীর আর-একদিকে ভীষণ খাদ! একবার পা ফস্‌কাইলেই হইল! গভীর জলে ঢিল ছুঁড়িবার ন্যায় টুপ্ করিয়া কোন্ অতলে যে তলাইয়া যাইতে হইবে, ঠিকানা নাই!

শ্রান্ত-ক্লান্তিতেও হরেন সেনের উৎসাহের সীমা নাই। মাণিকরাজকে ডাকিয়া একটা মস্ত-বড় প্রস্তরখণ্ড ঠেলাঠেলি করিয়া তিনি খাদের দিকে গড়াইয়া দিলেন। কান পাতিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গড়গড় ধ্বনি শুনিলাম।

ছেলেমেয়েরা আবার ডুলিতে উঠিয়াছে। যে দুই-এক জায়গায় নামিতে হইয়াছে, তাহাতেই উহাদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। আমাদের সঙ্গে চারিটা ফ্লাস্ক জলপূর্ণ ছিল। এর মধ্যেই তিনটা খালি হইয়া গিয়াছে। আমাদের গলাও শুকাইয়া উঠিল, মুখও শুকাইয়া উঠিল। কারণ, নিকটে আর কোথাও জল পাইবার সম্ভাবনা নাই।

● **মরুভূমির দৃশ্য**—সম্মুখে হঠাৎ দেখি, অনেক দূর পর্য্যন্ত সবুজের কোন চিহ্ন নাই। এ যেন এক মরুভূমির দৃশ্য! এদিকে মাথার উপরে সূর্য্যদেব অগ্নি বর্ষণ করিতেছেন। আমাদের পায়ে ক্যানভাসের বুট তাতিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তবুও রক্ষা; নগ্ন পায়ে যাহারা চলিয়াছে, পাথরের উপরে তাহারা আর পা রাখিতে পারিতেছে না, লাফাইতে-লাফাইতে চলিতেছে।

রাস্তার পাশে একটা গলিত শব দেখা গেল। দেহটা স্ত্রীলোকের, হয়ত সূর্য্যের তাপেই সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে।

মনে হইল, এই ন্যাড়া পাহাড়ের কি আর শেষ নাই?

দুর্ব্বাসার রক্তচক্ষুর দৃষ্টির বাহিরে না যাইতে পারিলে যে পুড়িয়া মরিতে হইবে! যে গলিত শবটা পেছনে ফেলিয়া আসিয়াছি তাহা বোধ হয় এতক্ষণে অঙ্গার হইয়া গেল!

● সবুজের মায়া—আবার গাছপালা নজরে পড়িতেছে, আর একটু গেলেই ছায়া পাওয়া যাইবে। সবুজের মায়ায় আকৃষ্ট হইয়া একটু দ্রুত পা চালাইতে লাগিলাম। অভ্যস্ত পাহাড়ী কুলীদের অবস্থাও কাহিল। বিশ্রামের জন্য উহারাও অস্থির হইয়া উঠিয়াছে।

সহসা পেছন দিক হইতে একটা "গেল, গেল" রব উঠিল। মণ্টুদের ডুলিটা ভাঙ্গিয়া রাস্তার উপর পড়িয়াছে। ইন্দ্রদেও খুকু ও ঝুণ্টুকে দুই হাতে জাপটাইয়া ধরিয়া একটা প্রস্তরখণ্ডে হেলান দিয়া ঝোক সামলাইতেছে। ডুলিবাহক একজন কুলী পা পিছলাইয়া রাস্তার পাশে পড়িয়া রহিয়াছে, চিৎপাৎ! মণ্টু ভাঙ্গা ডুলির মধ্যে বসিয়াই দৃশ্যটা উপভোগ করিতেছে আর মিটমিট করিয়া হাসিতেছে। আর দুই হাত সরিয়া ডুলিটা পড়িলে এতক্ষণে উহারা দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া যাইত!

ভাঙ্গা ডুলিটা খাদের ভিতর নিক্ষেপ করিয়া কুলীরা মণ্টুদের পিঠে বাঁধিয়া লইল। কিছুদূর যাইবার পরেই ছায়া মিলিল।

একটা বাগানের মত প্রশস্ত জায়গা। কোনদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলাম।

আঃ কি আরাম! পবন-হিল্লোল থাকিয়া-থাকিয়া তাহার

স্নেহস্পর্শ হাতখানা চোখে-মুখে বুলাইতে লাগিল। আর যদি চোখ খুলিতে না হয়, বাঁচিয়া যাই। তুষার-শীতল গভীর জলে আস্তে-আস্তে যেন ডুবিয়া যাইতেছি! দেহের সমস্ত গ্রন্থিগুলি যেন আল্‌গা হইয়া গিয়াছে!

জ্ঞান আছে কিন্তু বোধ-শক্তি লুপ্তপ্রায়! মরিয়া যাইতেছি নাকি! ক্ষতি কি? এইভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িতেও আরাম। কিন্তু বাঁচিবার জন্যই ত যথাসর্ব্বস্ব পেছনে ফেলিয়া পলাইয়া আসিয়াছি,—মরিব কেন? আবার পথ চলিতে হইবে! এখনও সীতা-পাহাড়ের শেষ হয় নাই। আবার ক্যাম্পে পৌঁছিব—খাইয়া-দাইয়া চাঙ্গা হইয়া উঠিব—স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিশ্রাম করিব।

আশাই মানুষকে বাঁচাইয়া রাখে, আর বাঁচিবার আশাই সবচেয়ে বড় আশা। মানুষ জানে, না চাহিলেও একদিন মরিতেই হইবে। তবু বলে—

"মরিতে চাহি না আমি, সুন্দর ভুবনে।"

● **অর্থ-কৃপণ**—সহসা কাছেই একটা গোঙানি শুনিয়া চোখ মেলিয়া উঠিয়া বসিলাম। এ কি ভোজবাজি দেখিতেছি? —চোখটা ভাল করিয়া রগড়াইয়া লইলাম।

রূপকথার 'ঘুমন্ত পুরীর' মত হাজার-হাজার ইভাকুইজ সমস্ত জায়গাটা জুড়িয়া শুইয়া আছে। মাঝে-মাঝে দুই-একটা কাতর আর্ত্তনাদ ছাড়া আর কোন শব্দ নাই। যাহার

গোঙানি কানে যাইতে উঠিয়া বসিয়াছি, সে একজন গুজরাটি ভদ্রলোক।

তাহার দুই পায়ে বড়-বড় ফোস্কা পড়িয়া ফাটিয়া গিয়াছে —চোখ দুইটি জবাফুলের মত লাল।

দৃষ্টি-বিনিময় হইতেই অতি কষ্টে ফিস্‌ফিস্ করিয়া সে আমাকে বলিল, "বাবু, আমাকে বাঁচাও! আমার ট্যাঁকের জালিতে এক হাজার মোহর আছে। একটা ডুলির ব্যবস্থা কর, দোহাই তোমার। আমি উত্থানশক্তি-রহিত, এখানে প'ড়ে থাকলে আজ রাতেই আমায় শেয়ালে খেয়ে ফেলবে। তোমার ডুলিওয়ালাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সে আমার কথাই বুঝলো না।"

কথার জবাব আর কি দিব? আমি নীরবে পেছন ফিরিয়া বসিলাম। পয়সা খরচের ভয়ে হাজার মোহরের মালিক চৌদ্দ মাইল ক্যাম্প হইতে ডুলির বন্দোবস্ত করে নাই, এখন শেয়ালের ভয়ে আমার ডুলিওয়ালাকে ফুস্‌লাইয়া লইতে চাহে! বেটা হয়ত মনে করে, মোহরের লোভে আমি নিজের স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব—আর ও জামাইয়ের মত ডুলি চড়িয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইবে! কিন্তু যে বিরাট বপু, ডুলি মিলিলেই বা কোন্ কুলী উহাকে বহন করিতে চাহিবে? তবু একবার ডুলির জন্য খোঁজাখুঁজি করিলাম—যদি কোন উপকার করিতে পারি! কিন্তু সমস্ত পরিশ্রই বৃথা হইল, একটা জীর্ণ ডুলিও সংগ্রহ করিতে পারিলাম না।

গুজরাটী লোকটি আমায় ধন্যবাদ দিল, কিন্তু অসহায়ভাবে হতাশ হইয়া সেইখানেই পড়িয়া রহিল।

● **উৎকট-পিপাসা**—এই ছুটাছুটিতে আমার পরিশ্রমটা নিতান্ত কম হয় নাই। তৃষ্ণায় আমার ছাতি ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। ফ্লাস্কের তলায় একটুখানি মাত্র জল আছে, উহাই মুখের কাছে তুলিয়া ধরিলাম। কিন্তু পান করা আর হইল না। একটা লোক দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া পাগলের মত টলিতে টলিতে আসিয়া ধপাস্ করিয়া আমার সম্মুখে বসিয়া পড়িল! অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে একবার ফ্লাস্কটা, আর একবার সে নিজের মুখ-গহ্বরটা হাঁ করিয়া দেখাইতে লাগিল। বুঝিলাম, পিপাসায় কণ্ঠতালু শুষ্ক—বাক্য-নিঃসরণ হইতেছে না।

জলটুকু লোকটার মুখে ঢালিয়া দিলাম। সার ফিলিপ সিড্‌নির মত আমিও বলিয়া উঠিলাম, "Thy necessity is greater than mine."

লোকটির মুখে এইবার কথা ফুটিল। ভদ্রলোক বাঙ্গালী, রেঙ্গুণ-কলেজের একজন প্রফেসার; মামুলি বিনয় প্রকাশে আমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাইতে লাগিলেন। কিন্তু তখন সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করিবার মত আমাদের সময় ছিল না। এইবার আমাদের উঠিবার পালা।

রেণু ও ছেলেমেয়েরা ডুলিতে উঠিয়া বসিল। সেই 'হাজার আশ্‌রফির' মালিক গুজরাটী ভদ্রলোক ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া ডুলির

দিকে তাকাইতে লাগিল ; কিন্তু এইবার আমি সার ফিলিপ সিড্‌নি হইতে পারিলাম না।

জলের আনন্দ—সীতা-পাহাড় ক্যাম্প আরও চার মাইল দূরে। সঙ্গে আর এক ফোঁটা জলও নাই—এদিকে পিপাসায় মারা যাইতেছি। ছেলে মেয়েরা যদি একবার 'জল, জল," বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে, তখন কি করিব ?

হরেন সেন একটা ফ্লাস্ক লইয়া আগাইয়া গেলেন। কিন্তু দুরাশা—চার মাইলের আগে নাকি কোথাও জল নাই ! একটু পরেই হরেন সেনকে আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতে দেখা গেল।

কোন হিংস্র জন্তু তাড়া করিয়াছে নাকি ? পাহাড়ের অনেক নীচু হইতে একবার ব্যাঘ্র-গর্জ্জন শুনিয়াছিলাম। কেহ-কেহ নাকি দূর হইতে বন্যহস্তীও দেখিয়াছে। কোন্ বিপদে পড়া গেল, কে জানে ?

কিন্তু বিপদ নয়, ভগবানের আশীর্ব্বাদ ! হরেন সেন একটি ফ্লাস্কে জল ভরিয়া আনিয়াছেন। কিছুদূর আগে এক নাগা-জাতীয় স্ত্রীলোক বাঁশের চোঙায় করিয়া জল বিক্রয় করিতেছিল। উহার কাছে মাত্র দুই চোঙা জল ছিল ; এক চোঙাতে এক ফ্লাস্ক—দাম এক টাকা।

জল ফুরাইয়া গিয়াছিল বলিয়াই এতক্ষণ কেহ কিছু বলে নাই। এখন সকলেই একটু-একটু করিয়া জলপান করিল।

● **যথার্থ বন্ধু**—সীতা-পাহাড় ক্যাম্প আর মাত্র দুই মাইল দূরে। হরেন সৈন পরম উৎসাহে গতির বেগ বাড়াইয়া দিলেন—সকলের সঙ্গে পিছে পড়িয়া থাকিলে ক্যাম্পে হয়ত জায়গাই মিলিবে না।

এই পরোপকারী বন্ধুটির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার ভাষা আমার নাই। একা মানুষ, সঙ্গে একটা মানিব্যাগ ছাড়া আর কিছুই নাই। বলিষ্ঠ দেহ, ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই আমাদের ফেলিয়া অনেক আগেই দেশে গিয়া পৌঁছিতে পারিতেন। আজ আত্মীয় আত্মীয়ের খবর রাখে না, ভাই ভাইয়ের জন্য বসিয়া থাকে না, কেহ-কেহ নাকি স্ত্রী-পুত্র ফেলিয়াও চলিয়া আসিয়াছে! কিন্তু আমার এই সহপাঠী বন্ধু সেনবাবু আমাকে ফেলিতে পারেন নাই, সদাজাগ্রত দুইটি চক্ষু আমাদের উপর নিবদ্ধ রাখিয়া চলিয়াছেন সঙ্গে-সঙ্গে। এমন নিঃস্বার্থ বন্ধু-প্রেমের তুলনা নাই।

● **সীতা-পাহাড় ক্যাম্প**—ক্যাম্পে আসিয়া পৌঁছিলাম; একটা সম্পূর্ণ উলঙ্গ পাহাড়ের শীর্ষদেশে কয়েকখানা ঘর। বেলা দুইটা—হু-হু করিয়া বাতাস বহিতেছে, সূর্য্যের তেজ গায়ে লাগিতেছে না। যেদিকে তাকাই, কেবল পাহাড়—আর পাহাড়! প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইবার মত মনের অবস্থা তখন ছিল না—চুপ করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

● **পাঁচ টাকার জল**—দুইদিন যাবৎ স্নান করি নাই—মাথার চুলে জট ধরিয়াছে। গায়ের গেঞ্জিটার অবস্থা, যা দাঁড়াইয়াছে, তা আর বলিবার নয়! গেঞ্জিটায় সাবান দিতে হইবে—স্নান না করিতে পারি, ভাল করিয়া হাত-পা ও মাথাটা ধুইয়া ফেলিতে হইবে। আমি ও হরেন সেন দুইজনে জলের উদ্দেশ্যে রওনা হইলাম।

প্রায় মাইলখানেক উৎরাই ভাঙ্গিয়া যে জলের সাক্ষাৎ মিলিল, তাহাতে স্নানের আশা পরিত্যাগ করিতে হইল। কোন্ এক পাহাড়ের ফাটল হইতে ফোটা-ফোটা জল পড়িতেছে—অনেক দূর হইতে বাঁশের চোঙা দিয়া সেই জলই একটু-একটু করিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে। কিন্তু কাছেই একজন পুলিশ সে পাহারা দিতেছে—পান করা ছাড়া অন্য কাজে এই জল ব্যবহার নিষেধ।

আরও আধ মাইল নীচে নাকি কিছু বেশী জল পাওয়া যায় কিন্তু আর নামিতে সাহস হইল না। নামা এক রকম সহজ, কিন্তু আবার উঠিতে প্রাণান্ত হইতে হইবে।

হাঁপাইতে-হাঁপাইতে কোন রকমে উঠিয়া আসিলাম। পাঁচ টাকা বখ্‌শিস্ দিয়া কুলীদের তিন বালতি জল আনিতে পাঠাইয়া দিলাম। ইহাতেই রান্না হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় কাজ সারিতে হইবে।

● **চোখের ভুল**—রুটিন-মাফিক ভোর চারটায় আবার রওনা

হইলাম। এইবার আমরাই সর্ব্বাগ্রে। আমাদের পেছনে দুই-একটি দল আছে, কিন্তু লোকসংখ্যা বেশী নয়। অনেকেই সীতা-পাহাড় ক্যাম্পে পড়িয়া রহিয়াছে—শ্রান্ত, ক্লান্ত, মৃতপ্রায়। আমরা একটু-একটু নামিতেছি—হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইলাম।

সম্মুখে প্রকাণ্ড এক নদী। উষার অস্পষ্টালোকে নদীর ওপারে ক্ষীণ রেখার মত পাহাড়শ্রেণী দেখা যাইতেছে।

এই ভয়ঙ্কর নদী পার হইতে হইবে নাকি ?

কুলীর দল আসিয়া পড়িল। উহারা আমাদের ভাষা বোঝে না, কিন্তু কোন রকমে ভীতির কারণটা জানিতে পারিয়া হাসিয়া ফেলিল। যাহাকে আমাদের নদী বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল, উহা নদী নয়। একটা উপত্যকা মেঘে ছাইয়া ফেলিয়াছে, আর মেঘরাশি আটকা পড়িয়া নদীর মত দেখা যাইতেছে। কুলীরা উহার মধ্য দিয়াই পথ করিয়া অগ্রসর হইল। মেঘের খরস্পর্শে আমাদের কাপড়-জামা ভিজিয়া গেল।

● **সদ্যঃপ্রসূতি**—মাঝে-মাঝে চড়াইও পার হইতেছি কিন্তু তত সাংঘাতিক নয়। বেলা দশটায় আবার এক ক্যাম্পে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সীতা-পাহাড় পিছনে পড়িয়া রহিল, সেই সঙ্গে পড়িয়া রহিল অনেক যাত্রা—যাহাদের হয়ত ঐখানেই ইহজন্মের মত শেষ হইয়া যাইবে।

বিকালের দিকে খবর পাইলাম, আমাদের ক্যাম্পে এক

মাদ্রাজী মহিলা একটি কন্যা প্রসব করিয়াছেন। আশ্চর্য্য, এই অবস্থায় মহিলাটি এত পথ কেমন করিয়া আসিলেন? অবাক্ হইয়া গেলাম।

নির্ব্বিঘ্নে সন্তান প্রসব করিয়াই কিন্তু স্ত্রীলোকটির বিপদ হইল। মণিপুরী বৈষ্ণব কুলীরা আর এই অশুচি স্ত্রীলোকটিকে ডুলিতে বহিবে না। এখন উপায়? পথ যে আরও অনেক বাকি!

● **পুত্রহারা**—প্রসূতির কথা লইয়াই জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে; হঠাৎ আমাদের খানিকটা দূরে এক মর্ম্মভেদী ক্রন্দন-রোল উঠিল। আগাইয়া গেলাম।

এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের একটি শিশুপুত্র মারা গিয়াছে। নিউমোনিয়া হইয়াছিল এবং ঐ অবস্থায়ই পিতা শিশুটিকে বুকে করিয়া সীতা-পাহাড় পার হইয়া আসিয়াছিলেন।

ছেলেটির পিতার নাম বলরাম দাস। তিনি রেলওয়ের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের অফিসে কাজ করিতেন।

সংবাদ পাইয়া ক্যাম্প-কমাণ্ডার আসিয়া হুকুম দিলেন, "মৃতদেহ আর বেশীক্ষণ ক্যাম্পে রাখা চলবে না, যা হয় একটা ব্যবস্থা করুন।"

বলরামবাবু চোখ মুছিয়া মৃতপুত্র কোলে করিয়া চলিলেন একটা পাহাড়ের টিলার উপরে—ঐখানেই পাথরচাপা দিয়া পুঁতিয়া রাখিতে হইবে।

কো্ন্ মহাপ্রস্থানের পথে আমরা চলিয়াছি, কে জানে? রক্তমাংসের দেহ আমাদের—সুখ-দুঃখ, হিংসা-দ্বেষ, আহার-নিদ্রা কোনটার প্রভাবই আমরা এড়াইতে পারি নাই। উহারাও চলিয়াছে আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে, আর উহাদেরই সঙ্গে হাতে হাত মিলাইতেছে—জন্ম-মৃত্যু!

● **'উৎরাই' আরম্ভ**—আরও তিনটা পাহাড় পার হইলে তবে মণিপুর-রাজ্য। এখন হইতে উৎরাই আরম্ভ হইল।

অনেকে হয়ত মনে করেন চড়াই ওঠার চেয়ে উৎরাই-পথে নামা খুবই সহজ; কিন্তু এ অঞ্চলের পাহাড়ীয়া পথ মোটেই সেরূপ নহে। চড়াই-পথ যেমন খাড়া উঠিয়া গিয়াছে, উৎরাই-পথও তেমন খাড় নামিয়া গিয়াছে। নামিতে-নামিতে হাঁটুতে খিল ধরিয়া যায়। দুর্ব্বল ভারবাহী পশুর পিঠে যেমন অতিরিক্ত বোঝা চাপাইলে সে হাঁটু ভাঙ্গিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়ে—মনে হইল, আমরাও যে-কোন মুহূর্ত্তে তেমনি হুমড়ি খাইয়া পড়িব, আর উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিব না।

এইবার রেণুকেও ডুলি হইতে নামিতে হইল—এই পথে আরোহীসহ ডুলি বহিয়া নামা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

পেছন দিকে হেলিয়া, দুই হাতে ভর রাখিয়া বসিয়া-বসিয়া নামিতেছে। রেণু আগে, আমি পিছে। মাঝে-মাঝে রেণু আমাকে ধরিয়া ধরিয়া নামিতেছে।

সহরের রাস্তায় কুষ্ঠরোগী খঞ্জ ভিখারী যেমন এক অদ্ভুত

ভঙ্গীতে পা টানিয়া-টানিয়া চলে, আমরাও চলিতেছি সেই ভাবে। দশ হাত নামিয়াই পাঁচ মিনিট বিশ্রাম করিয়া দম লইতে হয়। আমাদের পেছনে নামিতেছে একটা অসম্ভব রকম মোটা মানুষ।

বারে-বারে ঘাড় ফিরাইয়া সতর্ক দৃষ্টিতে দেখিয়া লইতেছি। একবার হাত ফস্‌কাইয়া গড়াইতে-গড়াইতে আসিয়া যদি আমাদের পৃষ্ঠদেশে ধাক্কা দেয়, তবে আর রক্ষা নাই!

প্রায় দুই মাইল এইভাবে চলিয়া সমতল ক্ষেত্র পাওয়া গেল। আর পোয়াটেক মাইল গেলেই ক্যাম্প, কিন্তু এখনই চলা অসম্ভব। প্রায় ঘণ্টাখানেক ঐখানে বসিয়াই বিশ্রাম লইতে হইল।

● বন্ধুর কবিত্ব—রাস্তার পাশেই একটা খাড়া পাহাড়ের, দেয়াল উঠিয়া গিয়াছে—উপরে ব্ল্যাকবোর্ডের মত খানিকটা স্থান মসৃণ। হরেন সেন মন্টুর প্যাণ্টের পকেট খুঁজিয়া একটা চক বাহির করিলেন, তারপর অনেকখানি পথ ঘুরিয়া অতিকষ্টে উঠিয়া গিয়া দাঁড়াইলেন সেই ব্ল্যাকবোর্ডের সম্মুখে।

ভাবিলাম, বোধহয় তিনি কোন ছবি আঁকিবেন। জানিতাম, সেনবাবুর ছবি আঁকিবার হাত আছে। কিন্তু সেনবাবু ছবি আঁকিলেন না। বেশ বড়-বড় করিয়া লিখিয়া রাখিলেন—

"মূকং করোতি বাচালম্,
পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা ত্বমহং বন্দে
পরমানন্দ-মাধবম্॥"

হাসিয়া সেনবাবুকে বলিলাম, "সেনবাবু, বন্দনাটা না হয় আর একটা দিন পরেই করতেন—এখনও যে দুটো পাহাড় বাকী!"

সেনবাবু বলিলেন, 'খবর নিয়ে জেনেছি, ঐ পাহাড় তেমন কিছু নয়; —আর এমন স্থানই বা মিলবে কোথায়?"

সেনবাবু নামিয়া আসিতেছিলেন, বলিলাম, "নাম-ঠিকানা লিখে রাখুন। যে সব পরিচিতেরা পেছনে আসছে, তারা আমাদের খরটা জানতে পারবে।"

একটু ভাবিয়া সেনবাবু নিজের নামের বদলে আমার নাম আর ঠিকানাটা লিখিলেন।

আমি চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিলাম, "করলেন কি? লোকে মনে করবে বন্দনাটা লিখেছি আমিই; কিন্তু এ যে ভূতের মুখে রাম-নাম!"

সেনবাবু একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "এখনও ভগবান্ আছেন ব'লে বিশ্বাস হয় না? পাহাড়-পর্ব্বত ডিঙিয়ে এতদূর এলেন কি ক'রে? আমাকেই বা কে জুটিয়ে দিয়েছে? ভগবানের নাম নিয়ে ঠাট্টা ভাল নয়।"

দেখি, তিরস্কারসূচক দৃষ্টিতে রেণুও আমার দিকে চাহিয়া আছে। চুপ করিয়া রহিলাম।

সত্যই বাকী দুইটা পাহাড় পার হইতে আর ততটা বেগ পাইতে হইল না। এখন ক্রমে-ক্রমে আমরাও অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি—শরীরও শক্ত হইয়াছে। দূরে মণিপুরী গ্রাম দেখা

যাইতে লাগিল। ছোট-ছোট উপত্যকা-ভূমিতে নানা প্রকার শস্য-ক্ষেত্র রহিয়াছে।

● মণিপুর দর্শনে—একঘেয়ে অনুর্ব্বর পাহাড় দেখিতে-দেখিতে দৃষ্টি ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এইবার শস্যক্ষেত্রের শ্যামলিমা ও মণিপুরী কুটীরগুলি দেখিয়া পুলকে মন নাচিয়া উঠিল। পথের পাশে চরমান গাভীটিকেও যেন মনে হইল—কত পরিচিত, কত আপনার!

প্রাণে আশা জাগিয়াছে—এ যাত্রা বুঝি রক্ষা পাওয়া গেল! বাংলার মাটি, বাংলার জলের সঙ্গে পরিচয় নিকটতর হইয়া আসিতেছে।

রাস্তার দুই পাশে মণিপুরী কুটীরগুলি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ঘরের রঙ্ করা মাটির দেয়াল ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করিতেছে। রাস্তা হইতেই দেখা যাইতেছে দুয়ারের আশেপাশে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি—কোনটা পেটের, কোনটা হস্তাঙ্কিত! গৃহ-প্রাঙ্গণে একটি করিয়া কূপ আর তুলসী-মঞ্চ।

ছেলেমেয়ে স্ত্রী-পুরুষ ভীড় করিয়া আসিয়া সোৎসুক নেত্রে আমাদের পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

মণিপুর বভ্রুবাহনের দেশ। সকলের গলায়ই তুলসীর মালা,—কপালে রসকলি-তিলক। মণিপুরীদের গায়ের রঙ্ বেশ ফর্সা, তদুপরি চোখে-মুখে একটা কোমল লাবণ্যের ছাপ। মেয়েরাই বেশী সুন্দর। শুনিলাম, স্বভাবেও এদের উগ্রতা নাই।

টিকেন্দ্রজিতের কথা মনে হইলে এদেশের পুরুষগুলিকে সাহসী ও বীর্য্যবান্ বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়; কিন্তু পদে-পদে আমরা এমন পরিচয় পাইয়াছি, যাহাতে ইহাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্ত না করিয়া উপায় নেই।

মণিপুরী কুলীরা রাস্তায় আমাদের মোট-কাবুঁচকি খুলিয়া কেবল বিস্কুট চকোলেট্ চুরি করে নাই—কাপড়চোপড়ও কিছু-কিছু সরাইয়াছে। মণিপুর-রাজ্য দিয়া চলিতে-চলিতে পরে ইহাদের নৈতিক অধঃপতনের আরও নমুনা পাইয়াছি—কিন্তু তাহা সাড়ম্বরে প্রচার করিয়া কোন লাভ নাই।

মণিপুরে

● **প্রথম ক্যাম্প**—মণিপুরে পৌঁছিয়া প্রথম যে ক্যাম্পে উঠিলাম, সে স্থানের নাম—**ওয়াইন্‌জিন্‌**। ক্যাম্পে পা দিবামাত্র মণিপুরীরা দুধ, দই, মাছ, তরকারী, ফলমূল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে লইয়া আসিয়া হাজির হইল বিক্রী করিতে। এতদিন পরে এইসব দেখিয়া আর দর-দস্তুর করিয়া সময় নষ্ট করিতে পারিলাম না—অনেক-কিছু কিনিয়া ফেলিলাম।

আজ আমাদের বিরাট ভোজ। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত কতকগুলি লোককে যেন শ্রাদ্ধ-বাড়ীর ফলারে ডাকা হইয়াছে! কতক্ষণে রান্না হইবে, ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলাম। মাছভাজার গন্ধটা নাকে যাওয়াতে জিভে জল ঝরিতেছে।

আজ দেড় মাস আমরা উপবাসী। এই দেড় মাস পাথর-কুচি মেশানো অসিদ্ধ ডাল-ভাত উদরস্থ করিয়া পথ চলিয়াছি—ইহাকে উপবাস বলিব না ত' কি বলিব?

● **সেনবাবুর 'আর্ট'**—আহারান্তে একটা ডাবের জল পান করিবার ইচ্ছা হইল। মানুষ যত পায়, তত চায়—এই আমাদের স্বভাব।

মণিপুরী বিক্রেতারা তখনও ঘোরাঘুরি করিতেছে কিন্তু

তাঁহাদের নিকট ডাব নাই। বলিলে হয়ত যোগাড় করিয়া আনিবে; কিন্তু উহাদের কথা বুঝি না,—বলি কিরূপে ?

সেনবাবুকে বলিলাম, "আপনি ত' ছবি আঁকিতে জানেন, একটা ডাবের ছবি এঁকে ওদের বুঝিয়ে দিন না ?"

বুদ্ধিটা মন্দ নয়। সেনবাবু একটুকরা কাগজে কয়েকটা ডাবের ছবি আঁকিলেন এবং যাহাতে উহারা ঝুনা নারিকেল না আনিয়া হাজির করে, এইজন্য ছোট-ছোট করিয়া আঁকিলেন। আকার-ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলেন ঠিক্ এই জিনিষই আমরা চাই।

এক মণিপুরী মাথা নাড়িয়া সায় দিল, খুব বুঝিয়াছে। সেনবাবু আঙ্গুল গণিয়া দেখাইয়া দিলেন দশটা ডাব আমরা চাই।

মণিপুরী চলিয়া গেল এবং ঘণ্টাখানেক পরে দশটা বড়-বড় কাঁচা-পাকা পেঁপে লইয়া আমাদের ঘরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। অনেক কষ্টে যোগাড় করিয়াছে—কিন্তু দাম বেশী নয়, একটাকা।

আমরা ত' হাসিয়াই কুটপাটি! বলিলাম, "সেনবাবু, এই আপনার ছবি আকার বাহাদুরী! খান্—এখন এই দশটা ডাব আপনি নিজে একা খান্।"

সেনবাবুও হাসিয়া জবাব দিলেন, "ওরা আমার আর্টের কি বোঝে ?"

যাহা হউক, পেঁপেই বা মন্দ কি ? রাখিয়া দিলাম, পরে খাওয়া যাইবে।

সেনবাবুকে বলিলাম, "সেনবাবু, মণিপুরীরা মূর্খ হইলেও

জায়গাটা বড় ভাল। তিন রাত্রি এখানে না থেকে পাদমেকং ন গচ্ছামি।"

কিন্তু দেখিলাম, মাণিকরাজ ও ইন্দ্রদেও সিং উস্‌খুস্‌ করিতেছে। দেশের কাছে আসিয়াছে—এখন তাড়াতাড়ি উহারা সরিয়া পড়িতে চায়।

● **ইম্‌ফালের পথে**—ওয়াইন্‌জিন্‌ হইতে মোটর-বাসে আঠার-মাইল যাইয়া, তারপর মণিপুরের রাজধানী ইম্‌ফালের কাছে একটা ক্যাম্পে পৌঁছিতে হয়; কিন্তু মোটর-বাসের সংখ্যা খুবই কম। এদিকে এত ইভাকুইজ এখানে আসিয়া জড় হইতেছে যে, রোজ যে সাত-আটখানা বাস্‌ আসে, আসিবামাত্রই তাহা নিমেষে ভর্ত্তি হইয়া যায়। ছেলেমেয়ে লইয়া আমাদের উহাতে উঠা অসম্ভব।

বিকালের দিকে দেখিলাম, দুইজন বিখ্যাত দেশনেতা একটা বড় ঝক্‌ঝকে মোটরে চড়িয়া আমাদের ক্যাম্প পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের একজন—মাননীয় এম, এস্‌, আনে, আর একজন শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বড়দলই।

এই মোটর-বাসের অসুবিধার কথাটা উঁহাদের গোচর করিবার উদ্দেশ্যে নিকটে গিয়া হাজির হইলাম; আনে সাহেবকে একটা নমস্কার করিলাম, কিন্তু তিনি বোধহয় তাহা গ্রাহ্যই করিলেন না!

বড়দলই মহাশয় অবশ্য কথাটা শুনিলেন, কিন্তু কোন জবাব

দিতে পারিলেন না, দুইজন শ্বেতাঙ্গ তাঁহাকে গার্ড দিতেছে। যাহাতে কোন অভাব-অভিযোগ নেতাদের কানে না পৌঁছে, সে দিকে যেন উঁহাদের সতর্ক দৃষ্টি!

পরের দিন মাণিকরাজ ও ইন্দ্রদেও সিং চলিয়া গেল। কোনরকমে ঠেলাঠেলি করিয়া উহারা বাসে উঠিতে পারিবে। এখান হইতেই দলে ভাঙন ধরিল।

সাধারণতঃ বাস্ আসে বেলা এগারোটা কি বারোটার সময় —কোন দিন দশখানা, কোন দিন বারোখানা। যাত্রীরা রাস্তার উপর লাইনবন্দী হইয়া বসিয়া থাকে। পুলিশ পাহারা দেয়। যাহারা আগে বসিবে, তাহারা আগে বাসে উঠিবে।

এই আগে বসিবার জন্য রাত্রি তিনটা হইতে রাস্তার উপর গিয়া লোক জড় হয়, ছোট-ছোট শিশু ও মেয়েদের লইয়া এই ভীড়ের মধ্যে বেলা বারোটা পর্যান্ত বসিয়া থাকে। আমাদের মত লোকের পক্ষে তাহা অসম্ভব। তিন দিনের দিন রাস্তার পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম।

দৈর্ঘ্যে এক মাইল পর্য্যন্ত রাস্তার উপর হাজার তিনেক লোক বসিয়া আছে বাসের প্রতীক্ষায়। রৌদ্রে তালু ফাটিয়া যাইতেছে কিন্তু উঠিয়া যাইবার জো নাই। একবার উঠিলেই আর একজন আসিয়া স্থান দখল করিবে।

আমরা পরে আসিয়াছি, সকলের পশ্চাতে এক মাইল দূরে আমাদের বসিতে হইবে। উপযুক্ত-সংখ্যক বাস্ না আসিলে আজও আমাদের যাওয়া হইবে না।

অগত্যা মরিয়া হইয়া ক্যাম্প-কমাণ্ডার সাহেবকে গিয়া অভিবাদন করিলাম; বলিলাম, "সাহেব, আমরা কুলী হ'লেও একটু ভদ্র কুলী; সঙ্গে শিশু ও ছেলেমেয়ে আছে। এই ভাবে যদি বাসের জন্য অপেক্ষা করতে হয়, তবে একমাসেও আমাদের যাওয়া হবে না।"

সাহেব আমার কথাটা বুঝিলেন এবং আমার সঙ্গে-সঙ্গে আসিয়া তদারকে নিযুক্ত সার্জ্জেণ্টকে বলিয়া দিলেন প্রথম বাস্‌টাতেই যেন আমাদের ভাল করিয়া উঠাইয়া দেওয়া হয়।

সাহেবকে প্রাণের সহিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলাম।

বেলা প্রায় এগারোটার সময় প্রথম বাস্‌টা আসিল সার্জ্জেণ্ট আমাদিগকে ভাল করিয়া বসাইয়া দিল।

● **দ্বিতীয় ক্যাম্প**—ইম্‌ফাল অতিক্রম করিয়া ক্যাম্পে আসিয়া পৌঁছিলাম। রাস্তার দুইপাশে কোন বড় গ্রাম বা বড় পাকা-বাড়ী নজরে পড়িল না। মনে হইল দেশটা বড় গরীব।

এই ক্যাম্প হইতে আবার মোটর-বাসে একশ' ছত্রিশ মাইল পার হইলেই আসামের রেল-ষ্টেশন ডিমাপুর। এই ডিমাপুর পৌঁছিতে পারিলেই আমাদের বিপদ কাটিয়া গেল। তখন—

চড়িয়া গাড়ী,
যাইব বাড়ী।

কাজেই আমরা সকলেই যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছি!

কথায়-কথায় দেশের কথা আসিয়া পড়িতেছে। নানারকম

হাসি-ঠাট্টাও চলিতেছে। সর্ব্বস্বান্ত হইয়া চলিয়াছি দেশে। যে চাকুরীর বাজার—সেদিকে টুঁ মারিবার জো নাই। কাচ্চা বাচ্চারা খাইবে কি? কিন্তু এই চিন্তা ক্ষণিকের জন্য মনে উঠিয়াই মিলাইয়া যাইতেছে। প্রাণ বাঁচাইয়া দেশে আসিয়া পড়িলাম, এই যথেষ্ট—খুসীতে মন ভরিয়া উঠিয়াছে।

শচীন্দ্র বলিল, "সেনবাবু, আপনার সঙ্গে এখনও ত অনেক টাকা আছে; একটা দোকান-টোকান দিলে আমাকে গোমস্তা রাখবেন?"

সেনবাবু বলিলেন, "দোকান দিব না, একটা ফিল্ম-কোম্পানী খুলব; আর 'সীতা হরণ' পালাতে তোমাকে দিব পবন-নন্দনের পার্ট! এক-একজন ফিল্ম-এক্টরের রোজগার কত, জান?"

সকলেই হাসিয়া উঠিলাম। আমি বলিলাম, "আমার কোন চিন্তা নাই। ব্রাহ্মণ মানুষ: একটা পাথরে সিঁদুর মাখিয়ে খালি গায় ব'সে থাকব রাস্তার পাশে—বটগাছের নীচে। দেখতে-দেখতে সেখানে মন্দির ধর্ম্মশালা গড়ে উঠবে। শচীন্দ্র যদি গাঁজার কল্কি নিয়ে চেলা সাজতে চায়, নিতে রাজী আছি।"

মণ্টু যে আমাদের কথাবার্ত্তা মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিল লক্ষ্য করি নাই, হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"কেন, কুলীগিরি ক'রে আমি তোমাদের খাওয়াতে পারব না?"

মণ্টুর বয়স এখনও পূরা আট বছর হয় নাই। হাসিয়া উঠিলাম; সঙ্গে-সঙ্গে খুসীও হইলাম এই বয়সেই উহার আত্ম-নির্ভরশীল মনের পরিচয় পাইয়া।

● **আসামের পথে**—ওয়াইনজিন্ ক্যাম্পের ন্যায় এইখানেও ক্যাম্প-কমাণ্ডারকে ধরিয়া মোটর-বাসে উঠিয়া বসিলাম, বায়ুবেগে বাস্ ছুটিয়া চলিল। আগে-পিছে ধূলি উড়াইয়া আরও কয়েকটা বাস্ চলিয়াছে। মাঝে-মাঝে আমাদের থামাইয়া গোরাসৈন্য-বোঝাই বাস্গুলি চলিয়া যাইতে লাগিল। ধূলার ঝাপ্টা সূঁচের মত আসিয়া নাকে-মুখে বিঁধিতে লাগিল। চেহারা হইয়া উঠিল ভূতের মতন।

একটি পাঞ্জাবী মহিলা গাড়ীর মধ্যেই বমি করিয়া ফেলিলেন। দেখাদেখি সেনবাবু আর নণ্টুও একবার করিয়া বমি করিল।

ওয়াইনজিন্ ক্যাম্পেই সেনবাবুর একটু আমাশয়ের মত হইয়াছিল। এখন আবার পেটব্যথা করিয়া পায়খানার বেগ দেখা দিল। বাস্ থামাইয়া সেনবাবু নামিয়া গেলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া ড্রাইভারের হাতে একটি টাকা গুঁজিয়া দিয়া বলিয়া দিলেন, আরও কয়েকবার হয়ত তাঁহাকে নামিতে হইবে—বলিবামাত্র যেন মোটর থামায়।

অর্দ্ধ-উলঙ্গ কুকীরা পাথর কাটিয়া রাস্তা বড় করিতেছে। আমাদের বাস্ দেখিয়াই তাহারা মুখভঙ্গী করিয়া ভেঙ্চাইতে লাগিল। কতকগুলি গোরাসৈন্য খালি গায়ে পাহাড়ের পাদদেশে ট্রেঞ্চ কাটিতেছে। সাদা ও কালোর এক অপূর্ব্ব সমন্বয়!

আসামে

● **কোহিমা**—কোহিমা নামক একটি ক্ষুদ্র সহরে আসিয়া বাস্ থামিল। ছোট হইলেও আসামের এই সহরটি বেশ সুন্দর—মনে হইল ছবির মত।

দুইজন লোক আসিয়া আমাদের এক-একটা করিয়া সিদ্ধ ডিম আর এক-একখানা পরোটা বিতরণ করিয়া গেল। নিকটেই জলের কল। মধ্যাহ্ন-ভোজন সারিয়া লইলাম।

সন্ধ্যা হয়-হয়, দূর হইতে ডিমাপুরের রেল-লাইন দেখিয়া যাত্রীরা উল্লাসধ্বনি করিয়া উঠিল। বাস্ আস্তে-আস্তে গিয়া ক্যাম্পে পৌঁছিল।

এই ক্যাম্পের ভার রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের হাতে। যিনি ইন্-চার্জ্জ, তিনি এক সময় রেঙ্গুণে ছিলেন, পরিচয় ছিল। খুব আদর-আপ্যায়ন করিলেন।

আমরা যাইব ট্রেণে চাঁদপুর পর্য্যন্ত। রাত্রি নয়টায় একটা গাড়ী আছে। খবর লইয়া জানা গেল, গাড়ী আজ ঘণ্টাদুই লেট।

স্নান করিয়া খাওয়া-দাওয়া সারিলাম। ডাল, ভাত, তরকারী অমৃতের মত লাগিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে ষ্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ষ্টেশনের

বাঙ্গালী কর্ম্মচারীরা খুব সাহায্য করিলেন। তাঁহারা একটা খালি গাড়ীতে আমাদিগকে উঠাইয়া দিয়া বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন, আর যেন কাহাকেও না উঠিতে দেই। 'বার্ম্মার ইভাকুইজ' বলিলে আর কেহ উঠিবেও না।

● **বদরপুর**—লামডিং ষ্টেশনে ট্রেণ বদল করিয়া বদরপুর আসিলাম। পঁয়ত্রিশটা টানেল্ পার হইতে হইল। শচীন্দ্ররা যাইবে ময়মনসিং। এইখানে উহারা নামিয়া গেল। হরেন সেন যাইবেন গোয়ালন্দ হইয়া কালিগঞ্জ-লাইনে, কাজেই আমাদের সঙ্গে চাঁদপুর পর্য্যন্ত যাইবেন।

● **ডিমাপুর**—ডিমাপুর পৌঁছিয়াই রেণুর একটু-একটু গা গরম হয়, এইবার কম্প দিয়া জ্বর আসিল। ম্যালেরিয়া—হাঁটা-পথে ঝরণার জল-পানের প্রতিক্রিয়া।

এইখানেও একটা ইভাকুইজ রিলিফ-সোসাইটি' আছে। ভলান্টিয়ারগণ খুব সাহায্য করিলেন।

আলাপ করিয়া জানিলাম, একটি ভলান্টিয়ারের বাড়ী আমাদের গ্রামের কাছেই। আমাদের সুখ-সুবিধার জন্য ছেলেটি ছুটাছুটি করিতে লাগিল। একজন এম্ বি ডাক্তার ডাকিয়া রেণুকে দেখাইল এবং ঔষধের ব্যবস্থা করিল। আমাদের সঙ্গে পরিধানের উপযোগী দ্বিতীয় কাপড়-চোপড় আছে কিনা জানিতে চাহিল। না থাকিলে তাহারও ব্যবস্থা করিবে।

এই সব সোনার ছেলে,—কি সুন্দর চরিত্র, সরল উদার! সুযোগ পাইলে ও [illegible] ঠিক [illegible] চালিত হইলে, একদিন ইহারা দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারে! কিন্তু হায়, কিছুদিন পরে ইহাদের নামও হয়ত কেহ আর শুনিবে না! [illegible]-সমুদ্রে মিশিয়া যাইবে রাম, শ্যাম, যদুর মত!

[illegible]লী কর্ম্মচারীরা খুব সাহায্য [illegible]

[illegible]ড়ীতে আমাদিগকে উঠাইয়া [illegible] কাটাইয়া ভোরে আসিয়া চাঁদপুর

করিয়া দিলেন। বলিয়া দি[illegible]

[illegible]ন্দ ষ্টীমার ছাড়িবার আর দেরী নাই।

সাশ্রুনেত্রে সেনবাবুকে বিদায় দিলাম। সেনবাবু প্রতিজ্ঞা করিলেন, শরীরটা একটু ভাল হইলেই বাড়ীতে আমাদের সঙ্গে আসিয়া দেখা করিবেন।

যতদূর দেখা যায়, সেনবাবুর গমন-পথের দিকে আমরা চাহিয়া রহিলাম। সেনবাবুও ফিরিয়া-ফিরিয়া আমাদের দিকে তাকাইতে লাগিলেন।

ষ্টীমার-ঘাট দূরে নয়। ষ্টীমারে গিয়া উঠিতেই আর তাঁহাকে দেখা গেল না। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া আমি চলিলাম আমাদের ব্যবস্থা করিতে।

পূর্ব্বে এইখান হইতে আমাদের অঞ্চলে একটা ফেরী ষ্টীমার যাতায়াত করিত। কয়েকদিন পূর্ব্বে উহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে; আমাদিগকে গিয়া নামিতে হইবে কার্ত্তিকপুর বা ঘরিসার গয়নার নৌকায়। দই, মুড়ি, মিঠাই ও লিচু, কলা ইত্যাদি কিনিয়া গয়নার নৌকায় উঠিলাম।

গয়নার নৌকা সম্বন্ধে একটা খারাপ ধারণা ছিল; কিন্তু তেমন কিছু দেখিলাম না। আরোহীরা সকলেই ভদ্রলোক, আর একটি বাঙ্গালী পরিবারও আছে। মাঝিরা আমাদের খুব ভাল জায়গায় বিছানা পাতিয়া দিল।

ত্যাগ

র চরিত্র, সরল উদা

হইলে, একদিন ই

কিন্তু হায়, কিছুদিন পরে

না! ...র-সমুদ্রে

'ও আমার দেশের মাটি,'

স্বগ্রামে—বেলা একটার সময় কা[illegible] গিয়া [illegible] ভিড়িল। এখান হইতে আমাদের গ্রাম মাত্র দুই মাইল। মাঠের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া যাইতে হয়। তিনজন মুটিয়া লইয়া রওনা হইলাম। মুকুল ও ছোট মেয়েটিকে উহারা কোলে করিয়া লইল। মুটিয়ারা আমাদের বাড়ী চেনে। তাহারা আগে-আগে যাইতে লাগিল।

বাল্যকালে কতবার এই রাস্তায় যাতায়াত করিয়াছি! কিন্তু আজ যেন সবই নূতন বলিয়া মনে হইতেছে।

এই ত' কান্তিকপুর ইংরেজী হাই স্কুল, কাছেই জমিদার-বাড়ী। প্রাইজ-ডিষ্ট্রিবিউশন, মিটিং বা যাত্রাগান শুনিতে এইখানে কতবার আসিয়াছি! যাহোক, অবশেষে মাঠে আসিয়া পড়িলাম।

রেণুর এখনও একটু-একটু জ্বর আছে। কাজেই আস্তে-আস্তে চলিলাম। কৃষকেরা ক্ষেতে কাজ করিতেছে।

মিলন—আর একটা বাগান পার হইলেই আমাদের বাড়ী দেখা যাইবে। সহসা হুড়মুড় করিয়া বৃষ্টি আসিয়া পড়িল। এই সময় দেখিতে পাইলাম, চষা-ক্ষেতের উপর দিয়া মা ও দাদা ছুটিয়া আসিতেছেন। মুটিয়ার মুখে তাঁহারা খবর পাইয়াছেন।

বাঙালী কর্ম্মচারীরা ... ছাড়িয়াই
...ড়ীতে আমাদি...
করিয়া দি...ন ... গড়াইতে
সাশ্রুনেত্রে ... সেনবাবুর
করিলেন, ... শোকটি মনে ...
সঙ্গে আসিয়া ...

২৮ ... এপ্রিল